# ইসলাম বিদ্বেষী পুস্তকের জবাব

ড. মুহাম্মদ আফসার আলী

# ইসলাম বিদ্বেষী পুস্তকের জবাব

ড. মুহাম্মদ আফসার আলী

| | | |
|---|---|---|
| প্রকাশক | : | সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সংঘ<br>এম. জি. রোড, কলকাতা ৭০০ ১০৪ |
| প্রথম প্রকাশ | : | জুন ২০১৫ (রমজান,১৪৩৬ হিজরি ) |
| দ্বিতীয় সংস্করণ | : | নভেম্বর ২০১৫<br>(মুহারহম্ ১৪৩৭ হিজরি ) |
| তৃতীয় সংস্করণ | : | নভেম্বর -২০১৮<br>ফতেহা দোয়াজদাহাম, ১৪৪০ হিজরি , |
| ISBN | : | 978-81-926506-1-6 |
| গ্রন্থস্বত্ব . | : | লেখক |
| মুদ্রণ এবং অক্ষরবিন্যাস | : | অনিশা<br>১৩২এ/১/ডব্লু রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র<br>রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৮৫ |
| মূল্য | : | ২৫ টাকা |

## দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

প্রফেসার আফসার আলী মহাশয়কে আমি বিগত ৪-৫ বৎসর ধরে চিনি একই মসজিদের মোক্তাদি হিসাবে । তাঁর অন্য একটি বই "সুদী অর্থনীতিঃ প্রগতির অন্তরায়" টিও পড়েছি। পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ মহান ভারত । তাঁরই মত শিক্ষা জগতের ব্যাক্তি প্র.ব্রহ্মচারীর ইসলামিক বিদ্বেষ পূর্ণ লেখা তথা ইসলাম ধর্মকে অন্যের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করা থেকে রক্ষা করার জন্য প্র. আলীর লেখনী গর্জে উঠেছে উনার ঈমান ও আক্বীদার তারাক্কীর জন্য । নিজের শিক্ষা জগতের লোকের বিরুদ্ধে লিখতে তাঁর হাত একটুও কেঁপে ওঠেনি । উনি এত নিখুঁত যে প্র. ব্রহ্মচারীর প্রতিটি বিকৃত খবর ও লেখনীকে কোরান ও হাদীসের তথা সমসাময়িক সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে খন্ডন করেছেন ।প্র. আলীর মতো লোক যদি মুসলিম সমাজে এগিয়ে আসে , তাহলে বিধর্মীদের কাছে একটি বার্তা যাবে এবং সমাজে ভুল বোঝাবুঝি দুরীভূত হবে। তাঁর এই বইটি দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম প্রকাশকের প্রুফ ভাল করে না দেখার জন্য কিছু কিছু ভুল ছিল; সেগুলি এবার সংশোধিত। প্র. আলী যে প্রতিবাদী বই লিখেছেন, তা মুসলিম উম্মার কাছে এক নতুন দিশা দেখাবে। এই বইটির যাতে আরো বেশী বেশী প্রচার ও প্রসার হয় তার সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি এবং প্র. আলীর মতো অকুতোভয় ব্যাক্তিরা যদি এগিয়ে আসে এইরূপ কু-কথার জবাব তাদের জ্ঞান , গরিমাও প্রজ্ঞার মাধ্যমে মানুষের দরবারে হাজির করেন , তাহলে তথাকথিত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মুখপাত্ররা তথা নিন্দুকেরা সচেতন হবে এবং সমাজে অনৈক্য অসহিষ্ণুতা দূরীভুত হয়ে নতুন সৃজনশীল, ভেদাভেদহীন শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে উঠবে । ভারত বিবিধের মাঝে এক মিলনতীর্থ হয়ে উঠবে এবং জগৎ সভার এক শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করবে, এই কামনা করে শেষ করছি।

১৩/১১/২০১৫

আই. এ. শাহ
চেয়ার পার্সন
পঃ বঃ সংখ্যা লঘু কমিশন
খাদ্যভবন
কোলকাতা-৭০০ ০৮৭

# প্রথম সংস্করণ লেখকের কথা

দিন কয়েক আগে এক বন্ধু আমাকে একখানা কুরুচি পূর্ণ পুস্তক দেন। সেটি পড়ার পরে কিছু করার থাকলে আমি যাতে করি, সে বিষয়ে তিনি আমাকে অনুরোধ করেন । ব্যাস্ততার কারণে কয়েক দিন টেবিলে পড়ে থাকার পরে, একদিন হঠাৎই পুস্তকটির অশ্লীল নামটির ওপরে নজর পড়ে । এক নিশ্বাসে সেটি পড়ে ফেলি । পুস্তকটি ইসলাম ও মুসলমানদের কে হেয় করার উদ্দেশ্যে , তথাকথিতএক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক দ্বারা লিখিত। সেটি পড়ার পরে আমার মনে হল যে, লেখক যে পরিমাণে এবং মাত্রায় মিথ্যা, কুৎসা গালাগালি ইত্যাদি ছড়িয়েছেন এবং সর্বোপরি সাধারণ জনগণকে যে ভাবে ইন্ডিয়ার ১৫ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩৫ শতাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, তাতে দেশের শান্তি- শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে। তাই সময় থাকতে উক্ত পুস্তকের লেখকের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাগুলোর সঠিক জ্ঞান ও যুক্তি ভিত্তিক উত্তর মানুষের কাছে পৌঁছানো জরুরী । যাতে লেখক তার ভুল বুঝতে পারেন এবং নিজেকে সংশোধন করে নেন। কোথাও অন্যায় হলে, তার প্রতিবাদ করা মানুষের ধর্ম। উক্ত পুস্তকের প্রায় প্রতিটি শব্দ দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের উপরে অন্যায় ভাবে আক্রমণ করা হয়েছে । অল্লাহ আমাকে এর প্রতিবাদ করার ক্ষমতা দেওয়ার পরেও , আমি যদি তা না করি , তাহলে তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে ।তাই, আমি অন্য সকল কাজ ছেড়ে আল্লাহ , পবিত্র কোআন আর নবী (সা.) এর উপরে আক্রমণের যথাযত উত্তর দেওয়ার জন্য কলম ধরি এবং এই পুস্তকটি লিখে ফেলি। আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ যে তিনি আমাকে এই কাজের উপযুক্ত মনে করলেন।

সুধী পাঠকবৃন্দের কাছে আমার অনুরোধ যে আপনারা এই পুস্তক পড়ার পরে চুপ করে না থেকে, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করুন , যাতে ভবিষ্যতে মুসলমানদেরকে এবং তাদের পবিত্র ধর্ম , আল্লাহ , পবিত্র কোরআন ও প্রিয় নবী (স.) কে পাঞ্চিং ব্যাগ হিসাবে ব্যাবহার করার বা যে কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায় আক্রমণ করার কেউ সাহস না পায়।

ড. মুহাম্মদ আফসার আলী
Email:alimadfsar09@gmail.com

# দ্বিতীয় সংস্করণের লেখকের কথা

আল্লাহার অশেষ রহমত যে প্রথম প্রকাশের মাত্র চার মাসের মধ্যেই সমস্ত বই শেষ হয়ে যায় । সুধী পাঠকবর্গকে তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই । বইটি পড়ার পরে অসংখ্য পাঠক পাঠিকা টেলিফোনে , পত্রের মাধ্যমে , সাক্ষাত করে আমাকে বইটি লেখার জন্য সাধুবাদ জানিয়েছেন ।একজন লেখকের এর চেয়ে বেশি আর কি প্রাপ্তি! আমি অভিভূত! যদিও এর আগে আমার কয়েকখানা বই প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু পাঠক সমাজের কাছে "ইসলাম বিদ্বেষী পুস্তকের জবাব" শীর্ষক এই বইটি জনপ্রিয়তা আগের সব বই কে ছাড়িয়ে গেছে । লেখ কের অভিবাদনের সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ আসে আরো বেশী সংখ্যক বই সরবরাহ করার জন্য। দ্বীনের জন্য, সমাজের দাবীকে উপেক্ষা করতে পারলাম না । সুতরাং, আর্থিক সমস্যা থাকলেও, দ্বিতীয় সংস্কারের ব্যায়ভার বহন করতে সম্মত হলাম। এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ বিভ্রাট জনিত ভুল ত্রূটি যেমন সংশোধন করা হয়েছে , তেমন সুধী পাঠকদের সুচিন্তিত পরামর্শকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাঠক সমাজের কাছে প্রত্যাশা রইল - বইটির মধ্যে ভালো কিছু যদি থেকে থাকে, তাহলে তাঁরা যেন সেটাকে আরোও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেন এবং তাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে বইটির আরো বেশী সমৃদ্ধি ও শ্রী বৃদ্ধির ব্যাপারে সহযোগিতা করেন।

আল্লাহ আমার এই কাজকে যেন তাঁর পথে কাজ বলে কবুল করেন ।

ধন্যবাদান্তে,
১৩ই নভেম্বর, ২০১৫
কোলকাতা

ইতি
লেখক
ড. মুহঃ আসফার আলী

## তৃতীয় সংস্কারের ভূমিকা

২০১৫ সালের রমজান মাসে "ইসলাম বিদ্বেষী পুস্তকের জবাব" পুস্তিকাটির প্রথম শুভ প্রকাশের পর থেকেই এরূপ জবাবী পুস্তকের গুরুত্ব বুঝতে পারি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ দুটি শেষ হয়ে যায়। পুস্তকের চাহিদা বাড়তে থাকে। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের অনুরোধ জোরদার হতেই থাকে। কিন্তু নিজের পেশাগত ও অনান্য ব্যাস্ততা ও বড়ো অঙ্কের মুদ্রণ খরচের কথা ভেবে এই সংস্করণটি ছাপানোর কাজটি আগে নিতে পারিনি। কারণ আমাদের সমাজের পাঠকরা বিলাসিতা সহ সকল বিষয়ে অর্থ ব্যায় করলেও বই পুস্তকের দাম দিতে অভ্যস্থ নয়। কিন্তু যে সমাজ বইপুস্তক থেকে দূরে থাকে — সে উন্নতি তো দূরের কথাটিকেও থাকতে পারবে না। এই বাস্তবতা বুঝি বলেই, এই দূর্ভাগা সমাজের লেখক হওয়ার যন্ত্রণা পোহাতে হয়। দৃষ্টিবানেরা আসন্ন ঝড়ের বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরাতে পারে না। তাই এই পুস্তিকাটির তৃতীয় মুদ্রণের দায়ভারও গ্রহণ করলাম।

তবে এই পুস্তিকাটি পাঠক মহলে আশাতিত সম্মান পেয়েছে। মানুষ এই ধরণের লেখনির জন্য মনে হয় দীর্ঘ অপেক্ষায় ছিলেন। তা পেয়ে ও পড়ে তাঁরা লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা জানিয়েছেন—আমি মুগ্ধ! এই সন্তুষ্টি থেকে আমি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে — মানবতার ভাতৃত্বের, শান্তির প্রগতির শত্রুরা প্রতিনিয়ত ঘৃণা, বিদ্বেষ, দাঙ্গা ফাসাদ লাগানোর জন্য প্রতিনিয়ত এই ধরণের যে মিথ্যা, ঘৃণা ছড়ানোর লেখা লিখে চলেছেন, আমি সাধ্যমত সেগুলোর জবাবী লেখনি লিখবো — আল্লাহ চাইলে। পাঠকদের কাছে অনুরোধ যে আপনারা সে ধরণের ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে রচিত লেখনি পেলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমি ইনসাআল্লাহ সাধ্যমত তার বিহিত করবো।

এই পুস্তকটি রচনার আমার পরিবারের সদস্য — আমার স্ত্রী ও সন্তানদের সহযোগিতা কৃতার্থ চিত্তে স্বীকার করছি।

ইতি

লেখক,

ড. মুহঃ আফসার আলী

অধ্যক্ষ

শহীদ নুরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়।

উত্তর ২৪ পরগণা

২১শে নভেম্বর, ২০১৮

ফতেহা দোহাজ দাহাম, কোলকাতা

# উৎসর্গ

আমার মহরুমা মা— বাবা ও শ্বশুর মহাশয়ের রুহ—এর কল্যাণ কামনায় এই বইটি উৎসর্গ করলাম।

প্রকৃতির মধ্যে দুই ধরণের শক্তি আছে — আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি। চুম্বকের বিপরীত ধর্মী মেরু যেমন পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তেমনি বিপরীত ধর্মী তড়িৎও পরস্পরকে আকর্ষণ করে। আবার চুম্বকের সমধর্মী মেরু ও তড়িৎ - এর সম - আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। আকর্ষণ শক্তি কাছে নিয়ে আসে, একতাবদ্ধ করে, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করে। অপরপক্ষে বিকর্ষণ শক্তি এর ঠিক উল্টো কাজ করে। অর্থাৎ দূরে ঠেলে দেয়, একতা ভেঙে অনৈক্যের সৃষ্টি করে, দুর্বল করে দেয়। ভৌত জগতের মতো মানুষের সমাজেও এই দুই ধরণের শক্তি আছে কিন্তু তাদের কাজের নিয়ম এখানে উল্টো। যেমন উপরের নিয়মে বিপরীত চরিত্রের মধ্যে আকর্ষণ হওয়ার কথা, কিন্তু তা সব সময় হয় না নারী - পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক আকর্ষণ হওয়ার কথা, কিন্তু তা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে, পরিবর্তে পুরুষ পুরুষ, নারী নারী আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই নিয়মে, সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃথক চরিত্রের মধ্যে স্বাভাবিক টান বা ভালবাসা থাকা উচিত ছিল, কিন্তু পরিবর্তে আমরা দেখছি একধরণের বিকর্ষণ, বিদ্বেষের বাতাবরণ তৈরী করা হচ্ছে। আর মনে রাখা দরকার যা প্রকৃতি বিরুদ্ধ, তাই ধ্বংসাত্মক।

আবার শক্তির প্রয়োজনও আছে, কারণ শক্তি ছাড়া সব কিছুই অচল। তাই, আমাদের দেখতে হবে মানব সমাজে কোন ধরণের শক্তির বিশেষ প্রয়োজন? — সেই শক্তিরই লালন করতে হবে। প্রথম ধরণের শক্তি হল ভালবাসা এবং বন্ধুত্বের শক্তি -যা মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, শান্তি ও প্রগতি নিশ্চিন্ত করে। আর দ্বিতীয় প্রকারের হল — ঘৃণা ও বিদ্বেষের শক্তি যেটা মানুষের মধ্যে শত্রুতা, অনৈক্য, অশান্তি ও ধ্বংস নিশ্চিত করে। তাই মানব সমাজের কল্যাণের নিমিত্তে এটা নিশ্চিন্ত করা দরকার যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ কোন সময়ই যাতে ভালোবাসা এবং বন্ধুত্বের শক্তিকে চাপা না দিয়ে দেয়। সেই উদ্দেশ্যে আমার কলম ধরা। আবার কিছু লোক কলম ধরেন ঠিক উল্টো কাজটি করার জন্য - সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষ চাষ করার জন্য। তাদের লেখনির দ্বারা তারা সত্যকে এমন ভাবে বিকৃত করেন যাতে সত্যকে মনে হয় অসত্য, আর অসত্যকে মনে হয় সত্য, সাধুকে মনে হয় চোর, আর চোরকে মনে হয় সাধু, আলোকে অন্ধকার আর অন্ধকার কে আলো, ইত্যাদি। আর, দেশের অধিকাংশ মানুষ সরলমতিতে সে সব লেখনিগুলোতে ধ্রুবসত্য হিসাবে গ্রহণ করেন। ফলে সমাজে ঘৃণা, বিদ্বেষ,

হিংসা, খুনো-খুনি, দাঙ্গা, ধর্ষণ, আগুন, প্রতিদিন বেড়েই চলেছে! এতে সমাজের শান্তিপ্রিয়, প্রগতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যেমন বিচলিত উদ্বিগ্ন, ক্ষতিগ্রস্ত, তেমনি দেশে শান্তি শৃঙ্খলা উন্নতি প্রগতি বিপর্যস্ত।

বাজারে প্রায় প্রতিদিন ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী একটা না একটা লেখা বের হচ্ছে। সেই লেখাগুলোর বিষয়বস্তু হল কোনো একটা বা দুটো ধর্ম ও তার অনুসরণকারীদের নৃশংস, বর্বর, মানবসভ্যতার পক্ষে ভয়ঙ্কর, অমানুষ, জ্যানোয়ার ইত্যাদি ঋণাত্মক বিশেষণে বিভূষিত করে সাধারণ মানুষের সামনে পেশ করা। এতে পরিণাম যা হওয়ার তাই হয়— মানুষের মধ্যে হিংসা, দাঙ্গা বৃদ্ধি পায়— আমাদের সভ্যতার চাকা প্রগতির দিকে না এগিয়ে অবনতির দিকে ধাবিত হয়। এই ধরণেরই একটি সাম্প্রতিক লেখা হল ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর একটি কুরুচিপূর্ণ পুস্তক, *'অন্তিম গতিঃ আল্লার পতিতালয়'*, তুহিনা প্রকাশনী, ১২ সি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট , কলকাতা ৭৩ । প্রথম প্রকাশ ২০১২ এবং ২০১৪ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ । লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সের অধ্যাপক। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। তাঁর রুচির এবং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের স্তর তাঁর উক্ত পুস্তকের ছত্রে ছত্রে এমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, যে কোনো সভ্য সমাজ তাতে বিচলিত না হয়ে পারে না। ক' দিন আগে আমরাও উক্ত পুস্তকটি পাঠের দুর্ভাগ্য হয়েছিল, তাই ভদ্রলোক নামধারী সভ্য সমাজে বসবাসকারী কিছু শয়তানের ভূত ভাগানোর উদ্দেশ্যে আমার এই পুস্তকের অবতারণা ।

একটা বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্য আছে "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"। ড. ব্রহ্মচারী কতটা বিদ্বান! তা আমার জানা নেই । যাদের জ্ঞান আছে, তাঁরা জানেন যে কোর'আন আর হাদিসে দুই ধরণে জ্ঞান আছে, এক ধরণের হল সাধারণ আক্ষরিক, একটিমাত্র অর্থবহ, যেগুলির অর্থ সৃষ্টি জগতের পক্ষে বোঝা সম্ভব (মুহকামাত আয়াত)। আর এক ধরণের জ্ঞানের কথার অর্থ আক্ষরিকভাবে নেওয়া যায় না, সেগুলির অর্থ ব্যাপক, সেগুলির যথার্থ অর্থ স্রষ্টাই ভালো জানেন, সৃষ্টি কুলের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে সেই কথাগুলোর অর্থ সম্পূর্ণভাবে বোঝা সম্ভব নয় (মুতাসাবিহাত আয়াত)। যেমন, কোন মাধ্যম বা কম মেধাযুক্ত শিক্ষার্থীর দ্বারা শিক্ষকের প্রতিটি শব্দের অর্থ বোঝা সম্ভব নয়। এবার সেই শিক্ষার্থী শিক্ষকের যে কথার অর্থ বুঝতে পারলেন না, সেটা নিয়ে যদি তার মনগড়া বিকৃত অর্থ শিক্ষকের নামে প্রচার করে বেড়ায় সেটা—চরম অন্যায় এবং সেই শিক্ষার্থী শাস্তির যোগ্য। সেই একই অবস্থা আলোচ্য পুস্তকের লেখকের । বরং এর চেয়েও খারাপ তাঁর মানসিকতা, কারণ তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোর'আন, হাদিস থেকে তাঁর মনগড়া বিকৃত অর্থ মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা

করেছেন।— তাহলে তাঁর পরিণতি কী হওয়া উচিত?

লেখক তাঁর পুস্তকের পৃ. ৩-এ নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এইভাবে, "ইসলামি মতে আল্লা পৃথিবীতে কোরান নাযেল করার আগে এই পৃথিবীতে বিরাজ করছিল জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার অন্ধকার।" তিনি "আল্লাহ" শব্দটির সঠিক বানানও জানেন না! ইসলামের শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)—এর আগমণের আগে অনান্য নবীদের অস্বিস্ত এবং তাদের প্রতি আল্লাহ প্রেরিত জ্ঞান বা কিতাবের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তিনি অবহিত নন। আল্লাহ কোর'আন নাজিলের আগে যে সব কিতাব প্রেরণ করেছেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - যবুর (নবী দাউদ আ. -এর প্রতি), তলমুদ (নবী মুসা আ. - এর প্রতি), ইঞ্জিল (নবী ঈশা আ. - এর প্রতি)। সুতরাং, কোর'আন নজিলের আগে পৃথিবীতে কোন জ্ঞান আসেনি—একথা ভ্রান্ত। লেখক নিজেকে ইসলামের এত বড়ো পন্ডিত এবং ইসলামের স্কলারদের এতটাই অজ্ঞ মনে করেছেন যে নিঃসঙ্কোচে লিখেছেন, "মোল্লা ও মৌবভীরা এই মিথ্য কথা প্রচার করে চলেছে যে, ইসলামের অর্থ হল শান্তি"। — এবার আরবদেরকেও ব্রহ্মচারী সাহেবের কাছে শিখতে হবে আরবি ব্যাকরণ! ইসলাম একটি আরবি শব্দ যেটা মূল শব্দ "সাল্মা" থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হল—শান্তি, বিশুদ্ধতা, সমর্পণ, আনুগত্য। সহজভাবে বলা যায়—ঈশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করে যে শান্তি পাওয়া যায় তাই ইসলাম। কিন্তু ব্রহ্মচারী সাহেব কোনো এক দূরভিসন্ধিমূলক কারণে মানুষকে ভুল বোঝাতে চেয়েছেন এই বলে যে, ইসলাম মানে শান্তি নয়, বরং তা হল আল্লাহর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস।

তিনি ৪ নং পৃষ্ঠায় বলতে চেয়েছেন, "তাই আরব্য সবাজ আজও পশুপালনের স্তরেই পড়ে আছে, কৃষি ভিত্তিক সমাজে উন্নতি হতে পারেনি।" ডাহা অজ্ঞানতার কথা অথবা মিথ্যা কথা। একজন সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীও জানে যে আজকে আরব সভ্যতা শিল্পভিত্তিক,—যেটা পশুপালনের স্তরে তো নেই-ই বরং তা কৃষি স্তরের পরের উন্নত স্তরে পৌঁছেছে। আরও অবাক কান্ড যে, তিনি এই অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ধরেই তাঁর মূল্যবান মতামত দিয়ে বসলেন এই ভাষায়, "কাজেই ইসলাম হিন্দু ধর্ম থেকে নিকৃষ্ট হতে বাধ্য। হিন্দু ধর্মের দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি যা কিছু আছে, তার রচনাকারীরা ছিলেন অতিশয় শিক্ষিত ও অন্যন্ত মানবিক ও আধ্যাত্মিক সব ব্যাক্তিগণ, যাদের বলা হয় ঋষি।" তাহলে সেই হিন্দু ধর্মে আরাধ্যদের হাতে এত অস্ত্র থাকে কেন? হিন্দুধর্মের আইনগ্রন্থ মনুসংহিতায় অনার্যদের প্রতি এত নির্মম, অমানবিক বিধান দেওয়া আছে কি করে? তাহলে তার রচয়িতা ঋষিগণ অন্যন্ত মানবিক ও

আধ্যাত্মিক হন কি ভাবে? কারণ মানবিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও নিষ্ঠুরতা তো একসঙ্গে একই মানুষের মধ্যে বাস করতে পারে না। তিনি এখানেই থেমে নেই, পৃথিবীর সমস্ত নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি ইসলামকে দায়ী করেছেন এই ভাষায়, "এই নিষ্ঠুর নৃশংস সমাজে ইসলামের জন্ম হবার ফলে ইসলামের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে এই নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা।" তাঁর জেনে রাখা দরকার যে, বিশ্বব্যাপি নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা জন্য দায়ি মুসলিম বা ইসলাম নয়। আমেরিকার বিখ্যাত তদন্তকারী সংস্থা এফ. বি. আহ-এর তথ্য অনুসারে, ১৯৮০- ২০০৫ সালের মধ্যে যত সন্ত্রাসমূলক ঘটনা ঘটেছে তার মাত্র ৬ শতাংশ- এর জন্য মুসলিমরা দায়ি। ইউরোপের তদন্তকারী সংস্থা ইউরোপোল-এর তথ্য অনুসারে, ২০০৬—২০০৮-এর মধ্যে ইউরোপের মোট সন্ত্রাসমূলক ঘটনার মাত্র ০.৪ শতাংশ ঘটিয়েছে মুসলিমরা। পরে আরও কমেছে। ইন্ডিয়াতে ২০০৬-০৮ সালের মধ্যে মোট ২৬ টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটানো হয়। তার প্রায় সবগুলো ঘটিয়েছে আর.এস.এস. বাহিনী। স্বামী অসীমানন্দ (জিতেন চ্যাটার্জি), সাবধি প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর, কর্ণেল শ্রীকান্ত পুরোহিত, সুধাকর ত্রিবেণী, দয়ানন্দ পুরোহিত, সমীর কুলকার্নি সহ যারা এই সব বিস্ফোরণ গুলো ঘটিয়াছে এবং জেলে আছে বা ছিল তারা নিশ্চয় কেউ মুসলমান নয়। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে প্রথম সন্ত্রাসবাদী ঘটনা হল জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর হত্যা। কে করেছিল এই নৃশংস হত্যা? কোন মুসলিম করেছিল এই সন্ত্রাসবাদী কাজ?—এই হত্যা করেছিল আর. এস. এস-এর নাথুরাম বিনায়ক গডসে নয় (যদিও বলা হয় তাকে প্রাক্তন)। তারপরে দুই দুই জন প্রধানমন্ত্রী—মাননীয়া ইন্দিরা গান্ধী এবং মাননীয় রাজীব গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী থাকা কালীন হত্যা করা হয়েছিল। এদেরকে কোনও মুসলিম হত্যা করেননি। তাহলে মুসলিমরা নৃশংস কোথায়? ১৯৯০-২০০৬ সালের মধ্যে ULFA জঙ্গিরা ৭৪৯ টি নাশকতামূলক ঘটনা ঘটিয়েছেন—তারা কি কেউ মুসলিম? ২০০৬ সালে মাওবাদীদের কাছ থেকে পুলিস ৮৭৫ টি রকেট এবং ৩০টি রকেট লঞ্চার উদ্ধার করে (সূত্র ঃ The Times of India, 9.9.2006), দেশের ১/৪ অংশ মাওবাদীদের দখলে; তারা কি মুসলমান? পৃথিবীর একজন মানুষ হয়ে সবচেয়ে বেশী খুন করেছে হিটলার। সে ৬০ লাখ নিরপরাধ ইহুদিকে গ্যাস চেম্বারে দম বন্ধ করে মারে, জসেফ স্টালিন মারে ২ কোটি মানুষ, মাও-সে-তুং মারে প্রায় দেড় কোটি, বেনিটো মুসোলিনী ৪ লাখ, মেক্সিমিলিন রোবাস্পায়ার প্রায় আড়াই লাখ, অশোক ১ লাখ (কেবলমাত্র একটা যুদ্ধে) মানুষ মারে! এঁদের কেই বা মুসলমান বা কে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন? কেউ নয়। তাহলে, কোন ইসলাম তাদেরকে এই নৃশংতা ও

নিষ্ঠুরতার শিক্ষা দিল? অপরদিকে নবী মুহম্মদ (স.)—এর সমগ্র জীবনকালে তিনি যতগুলো যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন, তার সবগুলো মিলে উভয়পক্ষের মোট নিহতের সংখ্যা মাত্র ১০১৮ জন (সূত্র ঃ Stanley Lane poole, 1882, Mecca)। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কত লোক মারা গিয়েছিল। ইসলামিক যুদ্ধের সঙ্গে অনৈস্লামিক যুদ্ধের তুলনা করুন — দুটি বিশ্বযুদ্ধের মানুষ নিহত হয়েছে প্রায় ৫ কোটি (২ কোটি +৩ কোটি)। ব্রহ্মচারীবাবু, এই হচ্ছে ইসলামিক বনাম অনৈস্লামিক নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার নমুনা। তবুও কিন্তু আমরা অন্য ধর্ম-সংস্কৃতির বিষয়ে আঙুল তুলি না। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

লেখক পৃ. ৫-এ এবং আরো একাধিক জায়গায় সেই পুরানো গোয়েবলিয় মিথ্যা প্রচার করতে চেয়েছেন যে মানুষকে ভয় দেখিয়ে মুসলমান করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "আমাদের দেশে যে সব হিন্দু এক কালে প্রধানত প্রানের ভয়ে মুসলমান হয়েছে ..... "। যদি তাই হত, তাহলে ইন্ডিয়াতে মুসলমানরা প্রায় ৮০০ বছর রাজত্ব করার পরেও সেখানে প্রায় ৮০ শতাংশ অমুসলিম থাকা সম্ভব ছিল না। তিনি নিজেই বা কী করে অমুসলিম থেকে গেলেন? ঔরঙ্গজেবের তলওয়ারে কী ধার ছিল না? নাকি এই ৮০ শতাংশ ব্রহ্মচারী বাবুরা ঔরঙ্গজেবের আত্মীয় ছিলেন? ঔরঙ্গজেবের ইন্ডিয়াতে মুসলমান ছিলেন মাত্র ১ শতাংশ, আর এখন ১৪.২ শতাংশ (সূত্র ঃ আদমসুমারী, ২০১১)। এই সময়ের মধ্যে ইন্ডিয়াতে মুসলিমের কোন তলওয়ার ছিল?—এই জীবন্ত বাস্তবতাই লেখকের মনগড়া কাহিনীকে নস্যাৎ করেছে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে যে আজ এত মুসলমান বসবাস করেছেন, তাঁরা কিভাবে মুসলমান হলেন? কোন ইসলামিক সৈন্যবাহিনী সেখানে গিয়েছিল? ইসলামের কোন তলওয়ার ভয় দেখিয়েছিল? ভয় তো আছে উক্ত লেখকের মানসিকতায় —সত্যের সামনাসামনি হওয়ার ভয়?

বিখ্যাত চিন্তাবিদ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে ইসলাম ভয় প্রদর্শন বা নির্যাতিন তো করেই না বরং ইসলাম মানুষকে চিন্তার স্বাধীনতা দেয় ও দুর্বলদের ধর্মীয় নির্যাতন থেকে রক্ষা করে। তিনি লিখেছেন, "The new faith (Islam) allowed freedom of conscience to all who placed themselves under its protection. Islam rose as a protection against religious persecution and refuge for the oppressed . (সূত্রঃ Roy, . M.N, (1981) *The Historical Role of Islam*, 4th Edn, P 29, Delhi : Ajanta Publication)। আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর একটি উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে

প্রনিধানযোগ্য, "নবী (সা.) —এর অতি সরলতা, নিজেকে জাহির না করার প্রবণতা; কাজে গভীর মনোনিবেশ, বন্ধু এবং অনুসারিদের জন্য তাঁর নিবেদিত প্রাণ আত্মত্যাগ, তাঁর অটল সাহস ও নির্ভীকতা এবং ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস — এগুলিই তাঁকে সকল বাঁধা অতিক্রম করতে সাহায্য করেছিল ও সফলতা দিয়েছিল, কোন তলওয়াল নয়"। — গত ২০১৫ -এর ২১শে মার্চ লখনউ - এ আর.এস. এস নেতা প্রভু নারায়ন শ্রীবাস্তবও একই কথা বলেছেন, 'মুসলমান কিংবা খ্রিষ্টানদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, আসল সমস্যা হচ্ছে হিন্দু ধর্মের অস্পৃশ্যতা এবং জাতপাতের বাছবিচার। এখনও হিন্দুধর্মে নির্যাতিত হতে হয় দলিতদের । সেই কারণেই বহু হিন্দু ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন'। (সূত্র ঃ কলম, ২০১৫, ২২শে মার্চ, পৃ. ৭, কোলকাতা)। সুতরাং, উক্ত লেখকের মনগড়া তত্ত্ব, লোকেরা প্রাণভয়ে মুসলমান হয়েছে, তা ধোপে টেকে না।

৭নং পৃষ্ঠায় তিনি একটি আজগুবি 'তথ্য' দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে ইসলাম অনুসারে নাকি, "আজ থেকে ৪১৩৭ বছর আগে আল্লা পৃথিবী, আকাশ ও সপ্তস্বর্গ সৃষ্টি করেছিলেন।" —কিন্তু বাস্তবে এই তথ্য ইসলাম বর্হিভূত। পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে ইসলাম কোনো নিদিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ব দেয়না । পবিত্র কোর'আনে পৃথিবী সৃষ্টির সময় বোঝাতে আরবি 'আইয়াম' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে ।(সূত্রঃ পবিত্র কোর'আন, সুরা ঃ আররাফ: অধ্যায় - ৭ আয়াত — ৫৪) । এই শব্দটির দুটি অর্থ হয় -দিন এবং এক দীর্ঘ সময়কাল (Epoch) । এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থটি প্রযোজ্য। কোনো শব্দের কতগুলো অর্থ হয় এবং কোন প্রাসঙ্গিকতায় কোন অর্থটি গ্রহণ করতে হবে- তা জানতে হলে ভাষার গভীর জ্ঞান থাকা দরকার। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার যে আজ পর্যন্ত যত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে, তার একটাও পবিত্র কোর'আনের বিপক্ষে যায়নি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার হল বিগব্যাংগ তত্ত্ব। এই তত্ত্বও কিন্তু সংক্ষেপে ১৪০০ বছর আগের থেকে পবিত্র কোর'আন রয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্রষ্টা আল্লাহতওয়ালা বলছেন, "সেই লোকেরা (যারা নবীর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে) কী চিন্তা করে না যে, এই আসমান ও যমীন সবকিছুই মিলিত অবস্থায় ছিল, পরে আমরা সেগুলোকে আলাদা আলাদা করে দিয়েছি। এবং জল হতে প্রত্যেক জীবন্ত জিনিসকে সৃষ্টি করেছি? তারা কী (আমাদের সৃষ্টি ক্ষমতাকে) স্বীকার করে না "? (সূত্র ঃ পবিত্র কোর'আন, সুরাঃ আল আম্বিয়া: অধ্যায় -২১, আয়াত-৩০)। পবিত্র কোর'আন এর এই আয়াতটিতে সাম্প্রতিক কালের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে তুলে ধরা হয়েছে — প্রথম অংশটিতে বিগ

ব্যাংগ তত্ত্ব এবং শেষের অংশটিতে জীবনের প্রধান উপাদান যে জল, আরবের মরুভূমিতে বসে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সেই কথা নিখুঁতভাবে ভাবা হয়েছে। কারণ, একমাত্র স্রষ্টাই পারেন তাঁর সৃষ্টি রহস্যের সঠিক তত্ত্ব বলতে।

লেখক তাঁর লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা যেহেতু স্রষ্টা সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণা তৈরি করতে পারছেন না, তাই সহজেই বলতে পারছেন. "সৃষ্টির আগে আল্লা বা গডের কোন কাজ ছিল না।.....(শেষ বিচারের পরে) গড বা আল্লার কাজ ফুরিয়ে যাবে।" এটি সেই রকমের ঘটনা হল যে ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা তৈরি কোনো যন্ত্র ইঞ্জিনিয়ারের জ্ঞানের মধ্যে ত্রুটি খুঁজছে, তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্মের হিসাব চাইছে। ইঞ্জিনিয়ার যন্ত্রটি যেমন তৈরী করেন, তেমনি যন্ত্রটি ঠিকমতো যাতে কাজ করতে পারে এবং সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে সেটি যাতে রক্ষা পায় -সেই জন্য একটি 'নির্দেশিকা পুস্তিকা' বা Instruction Manual লেখেন। যন্ত্রের উচিৎ সেটি মেনে চলা যাতে তার ভালো হয়। এটিই বুদ্ধির ও যুক্তির কথা। আর যদি যন্ত্র সেটি না মেনে, প্রশ্ন করে তার স্রষ্টা ইঞ্জিনিয়ারের তাকে তৈরী করার আগে কোনো কাজ ছিল কি না? অথবা তাকে তৈরী করার পরেই বা ইঞ্জিনিয়ারের কী কাজ থাকবে?— একে মর্খামি ছাড়া আর কি বলা যাবে ? ঈশ্বর সর্বোৎকৃষ্ট ইঞ্জিনিয়ার, যিনি তাঁর সবোৎকৃষ্ট সৃষ্টি, মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং সেই মানুষের ভালো মন্দ কিসেতে আছে তা তাদেরকে জানানোর জন্য নির্দেশিকা পুস্তিকা হিসাবে বিভিন্ন গ্রন্থ এবং শেষে কোর'আন পাঠিয়েছেন। সেই বুদ্ধিমান সৃষ্টি, মানুষের উচিৎ সেটাকে মেনে চলা।

লেখক ইসলামের মানবতাবাদী শিক্ষার ব্যাপারে আবারও সহজ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন এইভাবে, "তলওয়ার দিয়ে প্রাণের ভয় না দেখালে কোন বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী মানুষ এইসব ছেলে ভুলানো গালগল্প বিশ্বাস করতে রাজী হবেন বলে মনে হয় না"। দেখা যাচ্ছে লেখকের সাধনার জ্ঞানের গভীর অভাব রয়েছে। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি(বিখ্যাত সেনানায়ক ও সম্রাট),এ. আর. রহমান (বিখ্যাত সঙ্গীত বিশারদ), ওয়ায়নি পোরনেল (দক্ষিণ আফ্রিকার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলোয়াড়), ইউসুফ লতিফ (আমেরিকার জাজ মিউজিসিয়ান), ভেলেন্টাইন ডি সেন্ট পয়েন্ট (ফরাসি লেখক, কবি, চিত্রকার , নাট্যকার, অধ্যাপক, সাংবাদিক), মাইকেল জ্যাকশন (আমেরিকার বিখ্যাত পপ ষ্টার), দীর্ঘ তালিকা হবে—তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাহলে এরা কি বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী নয়? - আর এদেরকে কেই বা তলওয়ার দেখিয়ে ভয় দেখালেন? লেখকের জেনে রাখা দরকার যে বর্তমান বিজ্ঞানের সভ্যতায় সবচেয়ে বেশী সম্প্রসারশীল ধর্ম হল ইসলাম। আর ইসলামকে সবচেয়ে

বেশি গ্রহণ করেছেন জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নত ইউরোপ আর আমেরিকা। ১৯৯০-২০০০ সালের মধ্যে সারা পৃথিবীতে যত লোক খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন তার চেয়ে প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ বেশি লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। (সূত্রঃ Guinness Book of World Record, 2003. P.142)।

লেখক আর একটি মনগড়া কথা লিখেছেন, "খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামে ভগবান অনেকটাই মানুষের মত। তাঁরা অনেক দূরে, স্বর্গে বাস করেন এবং সেখান থেকেই তাঁরা পর্থিব ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ইসলামি মতানুসারে আল্লার উচ্চতা ৬০ হাত এবং মুখমন্ডল মানুষের মত"। নিরাকার, সাদৃশ্যবিহীন সর্বোপরি একঈশ্বরে বিশ্বাস ইসলামের এই মূল ধারণায় তিনি আঘাত করেছেন, অথচ কোনো তথ্যসূত্র দেননি। তাঁরা দুঃসাহসিকতায় অবাক হতে হয়! পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাষায়, "বল আল্লাহ একজনই। তিনি কারও মুখাপেক্ষি নন। তিনি কারও সন্তান নন, তাঁরও কেউ সন্তান নন। তাঁর মত কেউ নেই।" (সূত্রঃ পবিত্র কোর'আন, সূরা ঃ ইখলাস, অধ্যায় ১১২)। আর আল্লাহ যে মানুষের কাছেই আছেন আছেন, কোনো দূর স্বর্গে নেই - পবিত্র কোর'আনের এই আয়াত থেকেই পরিস্কার, "হে নবী আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি নিকটে। আমাকে যে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং তার উত্তর দিয়ে থাকি। কাজেই আমার আহ্বানে সাড়া দেওয়া আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের কর্তব্য ঃ এসব কথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও। হয়ত তারা প্রকৃত সত্য পথের সন্ধান পাবে"। (সূত্র ঃ পবিত্র কোর'আন, সুরাঃ আল বাকারাহ, আয়াত —১৮৬)। ব্রহ্মচারীবাবুর জ্ঞানের এতটাই দৈন্যতা যে মন্তব্য নিস্প্রোয়জন।

তিনি উক্ত পুস্তকের ৯নং পৃষ্ঠায় অন্তত ঃ একটি সত্য কথা স্বীকার করেছেন যে, "হিন্দুর ঈশ্বর নিরাকার ও নিরগুণ"। কিন্তু তিনি এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন যে হিন্দুধর্মে নিরাকার এক ঈশ্বরের কথা বলা থাকলেও হিন্দুরা মূর্তিপূজা করেন কেন?

ইসলাম ধর্মকে ছোটো প্রমাণ করার জন্য তিনি তাঁর নিজের ধর্মের মানুষকেই ঈশ্বর বানিয়ে দিয়েছেন এই উক্তির মাধ্যমে, " যখন মানুষেরই উপলব্ধি হয় যে, এই বিশ্ব জগতে একমাত্র ব্রহ্মাই আছেন এবং আমরা যা দেখছি, যা শুনছি তা সবই এক ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ মাত্র। এবং সেই হিসাব সে নিজেও ব্রহ্ম, তখন তাকে বলে ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মবিদ। মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানী হলে কি হয়? মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানী হলে সে জন্ম ও পুর্নজন্মের চক্র থেকে মুক্তি পায়। মানুষ ভোগের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না, ত্যাগের মধ্য দিয়ে তা সম্ভব। ত্যাগ, তিতিক্ষা ও নিরন্তর সাধনার দ্বারাই

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব ।..... অর্থাৎ কোনো সাধক ব্রহ্মজ্ঞানী হলে তিনি নিজেই ব্রহ্ম বা ভগবাণ হয়ে যান।”- কিন্তু তার এতবড় বিস্তৃত ব্যাখ্যার পরেও আমাদের মতো সাধারণ বুদ্ধির মানুষের কাছে ব্যাপারটা পরিস্কার হল না। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলেই মানুষ কিভাবে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পেতে পারে?- তা কিন্তু পরিস্কার হয়নি তাঁর লেখায়। যেমন কেউ মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করলেই মৃত্যুর অমোঘ সত্য থেকে রেহাই পেতে পারে না । এটাই সত্য, যুক্তিযুক্ত। আবার, এটাও বোঝা গেলনা যে সৃষ্টই কী করে স্রষ্টা হতে পারে?- মানুষ ঈশ্বর হতে পারে কী করে ? তাহলে সেই মানুষ- ঈশ্বরের জন্ম-মৃত্যু, শুরু-শেষ থাকবে; থাকবে মানুষের সকল দুর্বলতা, যেমন মিথ্যা বলা, লোভ, লালসা, ক্ষধা -নিদ্রা, জরা -ব্যাধি ইত্যাদি। এগুলি কিন্তু ঈশ্বরের গুণাবলী নয়। এই সকল সীমাবদ্ধতার অধিকারী কেউ ঈশ্বর হতে পারেন না। আবার কোনো ঈশ্বরের যদি এই সকল সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা থাকে, তাহলে তাকে ঈশ্বর বলা যাবে না , মানুষই বলতে হবে।

উক্ত লেখকের ইসলাম সম্বন্ধে আর একটি আজগুবি কথা হল যে স্বর্গে প্রবেশের জন্য মুসলমানদের নাকি কোন ত্যাগ বা সাধনার প্রয়োজন হয় না। তাই দুনিয়াবাসীকে তিনি তাঁর মূল্যবান পুস্তক লিখে জানান দিচ্ছেন যে, “একজন মুসলমানের চরম আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি হল আল্লার স্বর্গ বা জান্নাতে প্রবেশ করা এবং অনন্তকাল সেখানে বসবাস করা ।অবশ্য এজন্য তার কোন ত্যাগ , তিতিক্ষা বা সাধনার প্রয়োজন নেই।”— তিনি আবার ১০ পৃষ্ঠায় বিষোদগার করেছেন, “এই পৃথিবীতে জীবিতকালে কে ভালো কাজ করেছে আর কে খারাপ কাজ করেছে, আল্লা সে বিচার করবেন না .... যারা মুসলমান এবং কলেমা তৈযবে বিশ্বাস করেছে , আল্লা তাদের সমস্ত দুষ্কর্ম ও পাহাড় প্রমাণ পাপ ক্ষমা করে দেবেন।” —১১নং পৃষ্ঠায় আরও ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়েছেন এই ভাষায়, “যে মুসলমান জীবনে কমপক্ষে একটা কাফের হত্যা করেছে, তারাই হল গাজী”। আর এহেন গাজীদের জন্য জান্নাত নাকি ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে! খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে যে তিনি কোথায় পেলেন এসব ভয়ঙ্কর কথাবার্তা? তিনি কিন্তু কোন তথ্যসূত্র দেননি! — ইসলামের একমাত্র আকর গ্রন্থ প্রবিত্র কোর'আন অনুসারে কোনো মানুষের জান্নাতে বা স্বর্গলোকে প্রবেশের জন্য পূর্বশর্ত হল তাকে চারটি কাজ করতেই হবে । সেগুলি হল— সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, ভালো কাজ করা, মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করা এবং ধৈর্য্য ধারণ করা। (সূত্র ঃ পবিত্র কোর'আন, সূরাঃ আল আসার, অধ্যায় -১০৩)। সুতরাং, বাস্তবে ইসলামের শিক্ষা হল লেককের তত্ত্বের বিপরীত; সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহর )

প্রতি ঈমান আনাই (অর্থাৎ, মুসলমান হওয়াই) জান্নাতে প্রবেশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে, প্রতিটি মুসলমানকে আরো তিনটি পরীক্ষায় পাস করতে হবে। সেগুলি হল—ভালো কাজ করা, মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করা এবং ধৈর্য্য ধারণ করা। তাহলে ব্রহ্মচারী বাবু কিভাবে লিখতে পারলেন যে মুসলমান যতকুকর্মই করুক না কেন আল্লাহ সব মাফ করে তাকে জান্নাতে স্থান দিবেন? আবার তিনি একই মুখে বলছেন যে কোনো মুসলমান যে অন্ততঃ একজন কাফেরকে (অমুসলমান) হত্যা করেছে, সে জান্নাতে যেতে পারবে? যদি আসল ঘটনা তাই হত, তাহলে ভারতে প্রায় ২০ কোটি মুসলমানের মধ্যে নিশ্চই অনেকে এতদিনে তাঁকে (উক্ত লেখককে) হত্যা করার চেষ্টা করে থাকবেন। আর তাহলে তিনি নিশ্চই আজকে উক্ত পুস্তক লেখার জায়গায় থাকতেন না। মুসলমানরা যে এত শান্তিপ্রিয় তার কারণ হল ইসলামের সেই শান্তির, মানবতার শিক্ষা ষা পবিত্র কোর'আনে আছে। একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে, "যদি কেউ কোন খুনের পরিবর্তে কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে কাউকে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যদি কেউ কাউকে জীবন দান করে, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে জীবন দান করল। কিন্তু এদের অবস্থা এই যে আমাদের রসুলগণ উপর্যুপরি তাদের নিকট সুস্পষ্ট হেদায়ত নিয়ে আগমণ করে, তা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক পৃথিবীতে খুবই বাড়াবাড়ি করতে থাকে।"(সূত্রঃ পবিত্র কোর'আন, সুরা ঃ আল মায়েদা, অধ্যায়—৫ আয়াত ৩২। তাহলে যেখানে আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে একজন নিরপরাধ মানুষকে সে হিন্দু হোক, বা মুসলিম, বা খ্রীষ্টান, বা ইহুদী, বা অন্য কেউ, হত্যা করা সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করার সমান, সেখানে ব্রহ্মচারী বাবুর কথা মত একজন নিরপরাধ অমুসলিম হত্যাকারীকে আল্লাহ কিভাবে জান্নাত পুরস্কার দিতে পারেন? — বন্ধু একটু পড়াশুনা করুন, একটু নিজের বুদ্ধিকে-যুক্তিকে কাজে লাগান, তার পরে কলম ধরুন। তাহলে দেখবেন স্রষ্টার সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি মানুষের অনেক কল্যাণ হবে, আর স্রষ্টাও সন্তুষ্ট হবেন। না জেনে বুঝে কলম ধরলে অপুরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। — আপনার নিজেরও।

তিনি পবিত্র কোর'আন থেকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ এক অমার্জনীয় অপরাধ। যেমন পবিত্র কোর'আনের সূরা আন নিসার (অধ্যায় ৪) ৩১ নং আয়াতে যা লেখা আছে, তা হল "তোমরা যদি সেই সব বড় বড় গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাক, যা হতে বিরত থাকার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে, তবে তোমাদের ছোট ছোট দোষ ত্রুটি তোমাদের হিসাব হতে খারিজ করে দিব। এবং তোমাদেরকে সম্মানের স্থানে দাখেল করব।" কিন্তু ব্রহ্মচারী মহাশয় কোনো এক

বিশেষ বার্তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সুন্দর মানবিক পবিত্র আয়াতটিকে বিকৃত করে লিখেছেন এইভাবে, "আমি তোমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের সবরকম পাপ ক্ষমা করে দেব এবং সম্মানের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেব। ৪/৩১।" — ভেবে দেখুন আয়াতটির অর্থ সম্পূর্ণ পাল্টে দেওয়া হয়েছে।—আসুন তাকে জিজ্ঞাসা করি একটি ছোট্ট প্রশ্ন "কেন?" — লেখক তার সীমাহীন দুঃসাহসিকতায় অন্য এক আয়াতকেও বিকৃত করেছেন। পবিত্র কোর'আনের সূরা আয-যুমার (অধ্যায় ৩৯), আয়াত ৩৪-৩৫। সঠিক আয়াতটি হল, "নেক আমলকারীদের (যারা ভাল কাজ করেছে) জন্য ইহাই প্রতিফল ঃ যেন তারা যে নিকৃষ্ট আমল করেছিল, তা তাদের হিসাব হতে আল্লাহতালা খারিজ করে দেন এবং যে উত্তম আমল তারা করেছিল, সেই অনুপাতে তিনি তাদের প্রতিফল দান করতে পারেন।" —অর্থাৎ, যারা ভালো ভালো কাজ করেছে, তাদের কিছু ভুল-ত্রুটি আল্লাহ মাফ করে দিবেন। এতে না আছে কোন অস্বাভাবিকতা, না আছে কোনো অন্যায়। ক্লাসের ফার্স্ট বয়ের ভালো পড়াশুনার বিনিময়ে শিক্ষক মহাশয় তার ছোট খাটো ভুল ত্রুটি ধরেন না। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু লেখক ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষের কারণে, অতি করুণাময় আল্লাহতালার কথাটির বিকৃত অর্থ দাঁড়িয়েছে সম্পূর্ণ উল্টো। যে "আল্লা বিশ্বাসীদের সমস্ত দুষ্কর্ম মাফ করে দেবেন ৩৯/ ৩৫।"

তাঁর পুস্তকের ১৩ নং পৃষ্ঠায় আর এক মনগড়া কথা বলে ইসলামকে নারী বিদ্বেষী প্রমাণ করতে চাইছেন। তাঁর কথায়, "শুধু পুরুষ মুসলমানরাই আল্লার জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলমান রমণীরা সেখানে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে না। তারা সকলেই নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।" বন্ধু আপনি তো উচ্চশিক্ষিত? আপনার বক্তব্যের সমর্থনে তথ্যসূত্র কি? জানেন আপনি কি আগুন লাগাতে চলেছেন? নাকি আপনার এ শখ অন্যাকে, অন্যের ধর্ম সংস্কৃতিকে গালাগাল দেওয়া? সত্যের ও সম্প্রীতির স্বার্থে আপনাকে একটি পরামর্শ দিয়ে রাখি এই যে, না জেনে কোনো বিষয়ে এবং বিশেষ করে ধর্মের বিষয়ে মুখ খুলবেন না বা কলম ধরবেন না। যাইহোক যখন কাদা ছিটিয়েছেন, তখন আমাকে পরিষ্কার তো করতেই হবে। কারণ সমাজের কাজ করা মানেই তো নোংরা পরিষ্কার করা, নোংরা ছড়ানো নয়। বলে রাখি যে, ইসলাম ধর্ম এবং তার পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোর'আনই নারীদেরকে সর্বপ্রথম মানবিক সমঅধিকার দিয়েছে। অন্য ধর্মগ্রন্থগুলো খুলে দেখুন সেখানে নারীদের অধিকারের ব্যাপার কী লেখা আছে? এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোর'আন ও হাদিসের অনেক দলিলের মধ্যে এখানে একটিমাত্র প্রাসঙ্গিক আয়াত পবিত্র কোর'আন থেকে তুলে ধরা হল, "আর যে নেক

কাজ করবে — সে পুরুষ হোক আর স্ত্রী হোক-সে যদি ঈমানদার হয় তবে এই ধরণের লোকই বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বিন্দু পরিমান হকও নষ্ট হতে পারবে না"। (সূত্র ঃ পবিত্র কোরআন, সূরা ঃ আন-নিসা, অধ্যায়-৪, আয়াত ১২৪)। সুতরাং, লিঙ্গের বার-বিচার নয়, যে যতটা ভালো কাজ করবে। তার সেই কাজের ভিতিত্তে সে বেহেশত বা জন্নাতে প্রবেশ করবে। তাহলে ব্রহ্মচারীবাবু কী করে এক বাক্যে লিখে ফেললেন যে ইসলামে শুধু পুরুষরাই জান্নাতে যাবেন এবং মুসলিম নারীরা জান্নাতে কোনোমতেই যেতে পারবেন না ? —আবার কী করে তিনি সমস্ত মুসলিম নারীর জন্য নরকের আগুনেই বা স্থায়ী নিবাস করে দিলেন? — এই সকল প্রশ্নের উত্তর চাই। অত সোজা নয় যে, আপনাদের মতো দুষ্কৃতিকারীরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, তার স্রষ্টা এবং তার নবীদের, অনুসারীদের সম্বন্ধে যা কিছু বলে ও লিখে যাবেন আর আমরা চুপ-চাপ সহ্য করবো। অন্যের দিকে আঙুল তুলার আগে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন, যদি পড়াশুনো করার অভ্যাস থেকে থাকে; তাহলে আপনাদের আইনগ্রস্থ মনুসংহিতা খানা পড়ে দেখুন; সেখানে নারীদের জন্য কী অধিকার নির্দিষ্ট করা আছে?

লেখক হয়তো আরবি 'হুর' শব্দের মানে বুঝতে পারেননি। তাঁর হয়তো মনে হয়েছে যে হুর শব্দের অর্থ হল সুন্দরী নারী। কিন্তু আসল অর্থ তা নয়; হুর শব্দের অর্থ হল সঙ্গী বা সঙ্গিনী, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় companion। সুতরাং, জন্নাতী পুরুষরা যেমন সেখানে ভালো সঙ্গিনী পাবেন, জান্নতী নারীরাও ভালো সঙ্গী পাবেন। আল্লাহর বিচারে কর্ম অনুসারে ফল হয়, কোনো বৈষম্য করা হয় না।

ইসলামকে ও ইসলামের নবীকে বদনাম করার জন্য আর এক পুরানো অস্ত্র তিনি বের করেছেন তাঁর সেই পুস্তকের ১৬নং পৃষ্ঠাতে । তাঁর ভাষাতেই বলি, "নবী মহম্মদ যখন একের পর এক নিকা করতে শুরু করলেন এবং ২২ পত্নীর এক হারেম তৈরী করলেন ....আরবের নবী মহম্মদের যে উদগ্র যৌন কামনা ফুটে উঠেছে তা এক অবিশ্যাস্য ব্যাপার"। ইসলাম ধর্ম ও আরবী ভাষার ওপরে লেখকের জ্ঞানের দৈন্যতা আগেই প্রমাণিত হয়েছে । তিনি অতি পবিত্র "আল্লাহ" বানানটি যেমন বার বার অবলীলায় ভুল লিখেছেন, তেমনি "মুহাম্মদ" বানানটিও একই অজ্ঞাতয় (বা তাচ্ছিল্যে) ভুল লিখে গেছেন। এর পরে আসি তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তুর ওপরে, যেটি সম্পূর্ণ ভুল এবং আগের মতই তথ্যসূত্র বিহীন! বাস্তব হল—নবীর (সা.) মোট পত্নী সংখ্যা জীবিত ও মৃত মিলে ১৩ জন। লেখক ২২ জনের হিসাব কোথায় পেলেন? —তাকে জবাব দিতে হবে। আর 'হেরেম' তৈরী ও 'উদগ্র যৌন কামনা'

ইত্যাদি কুরুচিপুর্ণ মিথ্যা কথাগুলি নবীর বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ব্যাবহার করা হয়েছে, পৃথিবীর ১/৪ অংশ মানুষের (মুসলমানের ) আল্লাহর পরেই সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র নবী মুহাম্মাদের(স.) চরিত্র কলঙ্কিত করার জন্য। বাস্তব ঘটনা হল- নবী (স.) তাঁর ২৫ বছরের ভরা যৌবনে বিয়ে করেছিলেন ৪০ বছর বয়সি, দুইবারের বিধবা এবং তিন সন্তানের মা (জীবিত এক ছেলে ও এক মেয়ে) খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে। এখানে কি উদগ্র যৌনতার গন্ধ পাচ্ছেন কেউ? নবী (সা.) কি তার সমবয়সি কুমারী মেয়ে পেতেন না? এবং তিনি তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ ২৫ বছর সুখের সংসার করেন, যতদিন না খাদিজা (রা) মারা যান। নবী (সা.) তাঁর ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত আর দ্বিতীয় মহিলার দিকে তাকিয়ে দেখেননি, দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন। এর পরেই যে স্ত্রীদের তিনি গ্রহণ করেছেন সবগুলোই করেছেন রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে। যৌন কামন নিবারণেই যদি একাধিক বিয়ের উদ্দেশ্যে হত তাহলে তিনি ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত তার অপেক্ষা করতেন কেন? মানুষের যৌন কামনা নিশ্চয় ৫০ বছরের পরে যা হয়, আগে তার চেয়ে বেশি থাকে। আরও একটি বিষয়, নবী(সা.) যাদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তাদের সবাই বিধবা ছিলেন, শুধু দুইজন ছাড়া। হজরত আয়েশা(রা.) এবং হজরত জয়নর (রা.)। জয়নর (রা.) কুমারী নয়, তালাকপ্রাপ্ত ছিলেন। অপপ্রচার করিয়া নবী (স.) -এর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আরো একটি নোংরা বিষয় প্রচার করে থাকে। সেটি হল হযরত জয়নর (রা.)- এর সঙ্গে নবী (স.)- এর বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়টি। অপপ্রচারটি হল যে--নবী (স.) তাঁর নিজস্ব পুত্রবধু যায়েদ বিন হারেশের (রা.) স্ত্রী হযরত জযনর (রা.) - এর রূপে এতটাই মুগ্ধ হয়ে পরেন যে পুত্রকে দিয়ে জয়নব (রা.) কে তালাক দেওয়ান এবং পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী কে নিজে বিবাহ করে নেন।- এবার এই অপপ্রচারটির জবাব দেওয়া যাক । প্রথমত ঃ যায়েদ বিন হারেশ নবী (সা.) এর পুত্র ছিলেন না। আরবদের নাম থেকেই তাদের পিতার পরিচয় পাওয়া যায় —' যায়েদ বিন হারেশ ' এই নামের অর্থ হল, হারেশের পুত্র যায়েদ। আরবি ভাষায় 'বিন' শব্দের অর্থ হল - পুত্র । সুতরাং জয়নব (রা.) নবী (স.) - এর পুত্রবধু ছিলেন না ; তিনি ছিলেন হারেশের পুত্রবধু ।

এবার প্রশ্ন হল নবী (স.) হারেশের পুত্রবধু জয়নব (রা.) কে বিয়ে করতে গেলেন কেন ? জয়নরের (রা.) বর যাদের ছিলেন একজন কৃতদাস এবং নবী(স.) কে বাবা বলে ডাকতেন। অর্থাৎ যায়েদ (রা.) ছিলেন নবী(সা.) - এর মুখ ডাকা পুত্র। দাসত্ব মুক্ত সমাজ গঠনের অংশ হিসাবে নবী (স.) যায়েদ(রা.) ক্রয় করে দাসত্বের জীবন

থেকে মুক্ত করে স্বাধীন জীবন -যাপনের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। এবং একজন কৃতদাসকে সমাজে সমান মর্যাদা দেওয়ার জন্য নিজের অভিজাত বংশের (যেটা আরবে তখনকার সমাজ ব্যাবস্থার সবচেয়ে অভিযাজ বংশ, কুরাইশ বংশ ছিল ) একজন মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মেয়েটি ছিল নবী(স.) এর নিজের ফুকাতো বোন হযরত জয়নব (রা.)। স্বাভাবিকভাবেই একজন অভিযাত বংশের মেয়ে হিসাবে একজন মুক্ত করা কৃতদাসের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে জয়নবের (রা.) তীব্র আপত্তি ছিল। কিন্তু নবী (সা.) - এর কথাকে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি — তাই এই বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন । কিন্তু তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি একাধিকবার বিয়ে ভাঙার পরিস্থিতি দাঁড়ায় কিন্তু নবী(স.) - এর হস্তক্ষেপে সাময়িকভাবে তা মিটে যায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। একসময় নবী বাধ্য হন তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের ইচ্ছায় সম্মতি জানাতে। সুতরাং হারেশের পুত্র ও পুত্রবধূর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

নবী(স.)- হচ্ছেন আল্লাহের দুত , সমাজ সংস্কার হচ্ছে তার জীবনের লক্ষ্য। ইসলাম পুর্ব আরব সমাজে মুখ ডাকা ছেলে মেয়ে নিজের জৈবিক চেলে মেয়ের মতোই সম্মান, মর্যাদা পেতো। এমনকি এরূপ মুখ ডাকা বাবা বা মায়ের মৃত্যুর পরে তাদের সম্পত্তিতেও জৈবিক সন্তানদের সমান ভাগ পেতো ।— এহেনো পরিস্থিতিতে, মুখ ডাকা ছেলে মেয়েরা তারা তাদের মুখ ডাকা বাবা মায়ের পরিবারের অন্দর মহলে অনায়াসে অবাধ যাতায়াত থাকতো। এতে বাড়ির যুবক -যুবতী মহিলা পুরুষের মধ্যে পারিবারিক স্বাভাবিক সম্পর্কের পবিত্রতা রক্ষায় নানা সমস্যা দেখা দিতো । যেমন , একজন যুবক পুরুষ যার সঙ্গে পারিবারটির রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই , শুধু মাত্র মুখ ডাকা পুত্র বা মুখ ডাকা ভাইয়ের পরিচয় নিয়ে বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ করতে ও বাড়ির যুবতী মেয়েদের সঙ্গে মুখ ডাকা ভাইয়ের পরিচয়ে নিয়ে জৈবিক ভাইয়ের মতোই মেলা মেশা করতেও পারে। কিন্তু মুখে ভাই বোন বললেও অন্তরে উভয় পক্ষেই জানে যে তারা পরস্পরের প্রকৃত ভাই বোন নয়। এই আত্মপ্রতারনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে পারিবারিক সম্পর্কের এই আলো আঁধারির ধুয়াশায় অনেক ক্ষেত্রেই এহেনো 'ভাই বোন' বা 'মা ছেলের' বা ' বাবা - মেয়ের' সম্পর্কের স্বাভাবিক পবিত্রতা বজায় থাকতো না। — এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুবই প্রয়োজন ছিল। তাই আল্লাহতওয়ালা নবী (স.) কে নির্দেশ দেন যায়েদ বিন হারেশের অর্থাৎ নবী(স.) এর মুখ ডাকা পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী হযরত জয়নর (রা) কে নিজে বিয়ে করে নিতে। যাতে সমাজে একটি তীব্র ও পরিস্কার বর্তা দেওয়া যায় যে কারও মুখ ডাকা ছেলে কখনও নিজের ছেলে হতে পারে না বা নিজের ছেলের মত নয়, এবং মুখ

ডাকা ছেলের বউ নিজের বউমা নয়। আর নবী(স.) যে কাজ নিজে করবেন, সকলের কাছে সেটা আবশ্যিক পালনীয় কর্তব্য হয়ে যাবে। হাজার বছর ধরে চলে আসা এরূপ একটি সামাজিক কুসংস্কার কেবলমাত্র মুখে উপদেশ দিয়ে নির্মুল করা সম্ভব ছিল না । তাই স্বয়ং নবী(স.) এর দ্বারা দৃষ্টান্ত স্থাপনের দরকার হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর নির্দেশে নবী (স.) সেই কাজটিই করেছিলেন মাত্র।

বিরুদ্ধবাদীদের এই কথা কখনও দাড়ায় না যে, নবী(স.) হজরত জয়নরের রূপে এতটাই মুগ্ধ হয়ে পড়েন যে যায়েদ বিন হারেশ (রা.) কে বলেন তার স্ত্রী জয়নর (রা). -ক তালাক দিতে, যাতে নিজে বিয়ে করতে পারেন। আগেই যেমন বলা হয়েছে যে হজরত (রা.) নবী(স.) এর কাছে অপরিচিত কেউ ছিলেন না যে হঠাৎ করে কোনো একদিন নবী(স.) তার অপরূপ রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। কারণ জয়নর (রা.) নবী(স.)— এর নিজের পরিবারের মেয়ে ছিলেন, তাঁর নিজের ফুফাতো বোন ছিলেন । তাই ছোটোবেলা তেকে শুরু করে যুবতী হওয়া পর্যন্ত হজরত জয়নর (রা.) - এর পুরো জীবটাই নবী(স.) এর চোখের সামনে , তাঁর প্রত্যক্ষ অভিভাকত্বে পরিচালিত হয়েছিল। সুতরাং জয়নর (রা.) কে দেখে তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

এ সব ঘটনা এটাও প্রমান করে যে—, একাধিক বিবাহের পিছনে যৌনতা নয়, ছিল অন্য কারণ -রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ । একদিকে মুঘল সম্রাট আকবর যেখানে ৫০০০— এর বেশি বিয়ে করে এবং অসংখ্য আংশিক মকয়ের বিয়ে (মুতা) করে আপনাদের কাছে সম্মানিত 'মহামতি' উপাধিতে উপাধিতে ভূষিত হচ্ছেন; সেখানে নবী(সা.) - এর অতি উন্নত চরিত্রে আপনারাই কালিমালিপ্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছেন! কেন? পাঁচ হাজার বেশি ,না ১৩বেশি? নিজেদের কর্ম-কান্ডকে বিচার করুক যুক্তি দিয়ে, বিদ্বেষ বা ঘৃণা দিয়ে নয়। আবার আপনাদের মত বুদ্ধিজাবিদের এটাও মনে রাখা দরকার যে, ভগবত গীতা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ ১৬,১০৮টি বিয়ে করেছিলেন।

লেখকের বিকৃত মানসিকতা প্রসূত আর একটি উদ্ধৃতি রয়েছে তাঁর পুস্তকের ১৭নং পৃষ্ঠাতে, " সমকাম বা পায়ুকাম করার জন্য অল্প বয়স্ক কিশোর বালক" আল্লাহ নাকি সরবরাহ করবেন জান্নাতি মুসলমানদের জন্য। তাঁর অনান্য উদ্ধৃতির মতো এক্ষেত্রে কোনো তথ্য সূত্র দেননি। কিন্তু তাঁর কাছে আমরা উপযুক্ত তথ্যসূত্র চাইছি। তিনি নিজেই যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা দিয়েও কি প্রমাণিত হয় এই উদ্ভট মানসিকতার কথা? — তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, "তাদের (জন্নাতি লোকদের) সেবায় নিযুক্ত

থাকবে চির কিশোরগণ (বা গেলেমগণ) তাদের দেখে মনে হবে যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা (৭৬/১২/১৭)!...ওরা (জন্নাতি লোকরা) সেখানে স্বর্ণখচিত আসনে বসবে, পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে হেলান দিয়ে বসবে এবং তাদের সেবায় নিযুক্ত থাকবে চির কিশোররা (৫৬/১২-১৭)"। একজন সুস্থ মানসিকতার লোকের কি এই উদ্ধৃতিগুলো পড়ে কোনভাবেই মনে হচ্ছে যে এই কিশোরগণকে 'সমকাম বা পায়ুকাম' করানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে? তাহলে সেই লোকের মাথায় 'সেবা' কথাটি মানেই কী 'সমকামিতা বা পয়ুকাম' বা যৌনতা- এর পোগ্রাম লোড করা আছে ,অন্য সেবা তার অভিধানে নেই ?- দেশের এবং সভ্যতার দুর্ভাগ্য যে এই ধরণের লোকেরা নিজেদেরকে ইন্টেলেকচুয়াল বা বুদ্ধিমান বলেন এবং সেই মিথ্যা অহমবোধের উপরে ভিত্তি করে পুস্তক রচনা করে সভ্য সমাজের সুশীল মানসিকতার দুর্গন্ধ ছড়ান। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত যে আমাদের মতোও কিছু লোক সবসময় সমসমাজে থাকেন, যারা এই ধরণের কুচক্রীদের সকল চক্রান্ত রোধ করার জন্য অতন্দ্রপ্রহরীর ন্যায় কাজ করেন।

ব্রহ্মচারীবাবু ইসলামের প্রতি বিষোদগার করতে করতে একসময় বলেই ফেললেন যে, "মানুষের আধ্যাত্মিক বা চারিত্রিক উন্নতির বিষয়ে ইসলামের কোন মাথাব্যাথা নেই ।" (ঐ পুস্তকের পৃষ্ঠাঃ ১৯)। এখানেই তিনি কোন তথ্যসূত্র দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি! তিনি হয়তো ধরেই নিয়েছিলেন যে ইসলাম ও মুসলমানরা হল "পাঞ্চিং ব্যাগ"। - তাই যেদিক থেকে খুশি, যখন খুশি তাকে আঘাত করা যাবে; ন্যায় - অন্যায় তর্ক- যুক্তি, কারণ- অকারণ- এসবের কোনো বালাই নেই! ভাবটা এমন যে, তাঁর ইচ্ছা হয়েছে তাই তিনি ইসলামকে গালাগাল দিয়েছেন !— এতে আবার কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে কেন?— না ব্রহ্মচারীবাবু ! আর নয়, আপনাকে কৈফিয়ত দিতেই হবে। এখানে আপনার উত্থাপিত মিথ্যা অভিযোগের জবাব দিচ্ছি ইসলামের আকরগ্রন্থ পবিত্র কোর'আন থেকে, "হে মানুষ! আমারই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী হতে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদেরকে জাতি ও ভ্রাতৃগোষ্ঠি বানিয়ে দিয়েছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো । বস্তুতঃ আল্লাহ নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানার্হ সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নীতি পরায়ণ"। (সূত্র ঃ পবিত্র কোর'আন , সূরাঃ আল -হুজুরাত, অধ্যায় -৪৯, আয়াত ১৩)। পবিত্র কোর'আনও (সহিহ) হাদিসের সহস্রাধিক নীতি -নৈতিকতার উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর শিক্ষার মধ্য থেকে, আর একটিমাত্র এখানে দেওয়া হল, "এখন দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা, যাদেরকে মানুষের হেদায়ত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত

করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখ এবং খোদার প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।"(সূত্র পবিত্র কোর'আন , সূরা ঃ আলে -ইমরান, অধ্যায়-৩ আয়াত ১১০)। সুধী পাঠকগণ , তাই কি মনে হচ্ছে যে , "মানুষের আধ্যাত্মিক বা চারিত্রিক উন্নতির বিষয়ে ইসলামের কোনো মাথাব্যাথা নেই ইসলামের মূল ভিত্তিই হল— বংশ , গোষ্ঠি, জাত-পাতের উর্ধে উঠে নীতি নৈতিকতা, ন্যায় পরায়নতা প্রতিষ্ঠা করা; মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত করা ভালো কাজের জন্য সাহায্য - সহযোগিতা করা; সমাজে সাম্য ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা, সংগ্রাম করা । ইসলামে চরিত্র গঠন বা আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা নেই বলার অর্থ হল ক্লাসের ফার্স্ট বয়টিকে নির্বোধ বলা। তাহলে অনান্যদের অবস্থান কোথায় তা সহজে অনুমেয়। এই অবস্থায়, ক্লাসের অন্যান্যরা যদি ফার্স্ট বয়ের বুদ্ধি কম বলে উপহাস করে -তাহলে সেটা কতটা হাস্যকর ব্যাপার!

আধ্যাত্মিকতা বলতে বোঝায় ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা । কোনো ব্যাক্তির তার ঈশ্বরের প্রতি যতটা বিশ্বাস আছে, তিনি ততটাই আধ্যাত্মিক। অনান্য যে কোনো ধর্ম - সম্প্রদায়ের তুলনায় সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা আল্লাহতে বেশি বিশ্বাস করেন ।- সুতরাং মুসলমানরা যে কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের তুলনায় বেশী আধ্যাত্মিক। এর প্রমান -হিন্দু , খ্রীষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ, জৈন , যে কোন ধর্মীয় - সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলমানরা বেশি ধর্ম পালন করেন। পৃথিবীতে যত লোক ধর্মীয় উপাসনা করেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হলেন মুসলমানরা। তাঁরা দিনে অন্তত পাঁচবার ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়ান (নামাজে)। ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোর'আন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পঠিত বই। মুসলমানরা স্রষ্টাকে ভয় করেন বলেই তাদের মধে মদ্যপায়ীর সংখ্যা সবচেয়ে কম। অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলিমদের উন্নত নীতি-নৈতিকতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বপক্ষে কয়েকটি তথ্য দেওয়া হল - সারা পৃথিবীতে প্রায় ১৪ কোটি মানুষ মদ সম্পর্কিত অসুখে ভুগছেন। আমেরিকার প্রতি বছর এক লাখ মানুষ এই কারণে মারা যান। কিন্তু মুসলিম দেশগুলিতে এই সংখ্যা নিত্যান্তভাবেই কম। সবচেয়ে বেশি মদ্যপায়ী ৩০টি দেশের মধ্যে মুসলিম দেশ হিসাবে শুধু তুর্কি তালিকার নিম্নে অবস্থান করছে। (সূত্রঃ Jamil, J. (2013), Muslim Most Civilized, Yet Not Enough, Pharos Media. Pub.)। শতকরা ৯৫ জনের বেশি আমেরিকান বাছ-বিচারহীনভাবে যৌনসম্ভোগ করেন। এই তালিকায় বিশ্বের যে ১৮ টি দেশের নাম আছে তার সবগুলোই তথা কথিত সভ্য দুনিয়া-এর দেশ, একটিও মুসলিম দেশ নয়। (সূত্র ঃ - ঐ) পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জুয়ারুর ১০ টি দেশের মধ্যে

সবকটিই পশ্চিমা দেশ। (সূত্রঃ ঐ)। 'আমেরিকার ১৭ বছরের কম বয়সী প্রায় তিন লাখ পঁচিশ হাজার শিশু বেশ্যাবৃত্তি বা ঐ ধরণের যৌনব্যাবসার ফাঁদে পড়ে দিন কাটাচ্ছে। কোনো মুসলিম দেশে এই সম্ভবনা প্রায় নেই।' (সূত্রঃ ঐ) । যথেষ্ট যৌন আচরণের কারণে পৃথিবীতে বছরে ৫ থেকে ৭ কোটি শিশুকে মাতৃগর্ভেই হত্যা করা হয়। আর মুসলিম দেশে এর হার অনান্য দেশের তুলনায় ২০ শতাংশ এর কম। (সূত্রঃ ঐ)। পৃথিবীতে ধর্ষণের ঘটনার নিরিখে প্রস্তুত তালিকার উপরে দিকের ৫০ টি দেশের মধ্যে ৯৫ শতাংশের বেশি নাম সেই সব দেশের যারা নিজেদেরকে 'সবচেয়ে বেশি প্রগতিশীল,'' 'সবচেয়ে বেশি শান্তিপ্রিয় ', এবং 'সবচেয়ে বেশি নারী স্বাধীনতার প্রবক্তা' বলে বলে দাবী করেন। (সূত্রঃ ঐ )। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে ১৬ কোটি মানুষ মানুষের দ্বারা খুন হয়েছেন, তাদের মধ্যে সাড়ে তেরো কোটি খুন করেছে পাঁচটি বৃহৎ শক্তি ধর দেশ, যেমন চীন, আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, এবং রাশিয়া। সম্প্রদায়গত ভাবে, ৯০ শতাংশ সন্ত্রাসের জন্য দায়ী খ্রীষ্টান,বৌদ্ধিষ্ট এবং নাস্তিকরা। (সূত্র ঃ ঐ)। মানুষের উপরে খুনের উদ্দেশ্যে হামলার ব্যাপারে মুসলিম প্রধান দেশগুলির তুলনায় আমেরিকাতে এই হার ১০ গুনের চেয়েও বেশী। মানুষ খুনের ব্যাপারে পৃথিবীতে প্রথমদিকের ৫০ টি দেশের মধ্যে প্রায় সবগুলিই পশ্চিমা দেশ। (সূত্রঃ ঐ)।

ইসলামের একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিধান হল —যিহাদ করা । আরবি শব্দ যিহাদের অর্থ খহল — ভালো কিছু করার জন্য চেষ্টা বা সংগ্রাম করা । একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার জন্য মন দিয়ে পড়াশুনা করেছে, আরবি ভাষার তার এই প্রয়াসকে বলা হবে যে ,সে যিহাদ করছে। যিহাদ সম্পর্কে পবিত্র কোর'আনে এবং নবী (সা.) — এর হাদিসে একাধিক উল্লেখ আছে। নবী (সা.) একবার সর্বোত্তম যিহাদ বলতে বলেছেন যে, "অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায়ের কথা বলা হল সর্বোত্তম যিহাদ । "( সূত্র ঃ মুসনাদ আহমেদ, নং ১৮৪৪৯)। আবার তিনি এ কথাও বলেছেন যে, বৃদ্ধ পিতা-মাতার দেখাশুনা করা হল সর্বোত্তম যিহাদ। নবী (সা.) — এর একটি হাদিস থেকে জানা যায় যে তিনি বলেছেন, "যদি দেখ তোমার সামনে কোনো অন্যায় হচ্ছে, তোমার ক্ষমতা থাকলে তা হাত দিয়ে আটকাও, না হলে অন্তত মুখে প্রতিবাদ করো, তাও না পারলে কমপক্ষে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে মনে মনে ঘৃণা পোষণ করো । আর যদি তুমি শেষেরটি করো তাহলে তুমি নিম্নস্তরের ইমানদার হবে ।" (সূত্রঃ সহীহ মুসলিম , খন্ড -১ অধ্যায় ২১ , নং ২৭৮৪)। অর্থাৎ পরিস্থিতি অনুসারে যিহাদের করণীয় কাজও পরিবর্তন হতে পারে । অন্যায়ের বিরুদ্ধে চেষ্টা সংঘর্ষে প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণও করা হতে পারে। আর উক্ত পুস্তকের লেখক নির্দ্ধিধায় লিখে দিলেন যে,

"ইসলামী জিহাদ হল পৃথিবীর সমস্ত অমুসলমান কাফেরদের পাইকারী হারে হত্যা করার বর্বর নির্দেশ । জিহাদ হল পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যতরকম বর্বরতার অনুষ্ঠান হয়েছে তার মধ্যে বর্বরতম ও সর্বাপেক্ষা পাশবিক হত্যালীলা। তরবারী, আগুন ও ধর্ষণের মধ্য দিয়ে নারী, শিশু, বৃদ্ধা নির্বিশেষে কাফের হত্যা করে তাদের সহায়, সম্বল, ধন দৌলত লুঠপাঠ করে তাদের জমি জায়গা দখল করার নামই জিহাদ"— তাঁর এই ধরণের মিথ্যা দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা -বার্তা থেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে তাঁর কোর'আন হাদিস , ইসলাম সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই । ধার করা বুদ্ধি দিয়ে আর কতদূর চলে। তিনি যদি পবিত্র কোর'আন পড়তেন তাহলে দেখতে পেতেন যে যিহাদ শুধু মুসলিমরাই নয়, অমুসলিমরাও করে। যেমন আল্লাহ বলছেন , "আমরা মানুষকে নিজেদের পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যাবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কোনো (মাবুদকে ) শরীক বানায় যাকে তুমি 'আমার শরীক বলে' জান না, তোমার উপর চাপ দেয় (যিহাদ করে) তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না "(সূত্র ঃ পবিত্র কোর'আন, সূরা আন -কাবুত, অধ্যায় ২৯, আয়াত-৮)। আবার আর এক জায়গায় আল্লাহ বলছেন, "কিন্তু তারা (পিতা মাতা )যদি আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্যে যাকে তুমি জানো না, চাপ দেয় (যেহাদ করে), তাহলে তাদের কথা কিছুতেই মানতে পারবে না। দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভালো ব্যাবহার করতেই থাক। কিন্তু অনুসরণ করবে সেই লোকের পথ যে আমার দিকে ফিরে আছে। পরে তোমাদের সকলকেই আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে । তখন আমি তোমাদের জানাব তোমরা কী রকম কাজ করতেছিলে।" ('সূত্র ঃ পবিত্র কোর'আন, সুরা -লোকমান, অধ্যায় -৩১ আয়াত -১৫)। - উপরের আয়াত দুটিতে লক্ষণীয় যে আরবি ভাষায় পিতা-মাতার দ্বারা তাদের সন্তানকে জোর দিয়ে বা চাপ দিয়ে কোনো কথা বলাকেও 'যিহাদ করা' বলা হয়েছে। তাহলে কি পিতা মাতা সন্তানের উপরে যিহাদ করতে গিয়ে তাকে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ধর্ষণ-ইত্যাদি পাশবিকতা প্রদর্শন করেন? কিন্তু লেখকের পুস্তক থেকে নেওয়া তাঁর বক্তব্যে তো যিহাদ বলতে তিনি তাই বুঝেছেন এবং ইসলামে যেহেতু যিহাদের (ভালো করার চেষ্টার) শিক্ষা আছে, তাই তিনি ইসলাম ও মুসলিম সমাজকে বর্বরতম, সর্বাপেক্ষা নৃশংস, পাশবিকতম ইত্যাদি গালাগাল দিয়ে নিজের বর্বরতা ও মূর্খামি জাহির করেছেন। এবার তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে, মুসলিম সমাজের সাথে সাথে সমগ্র অমুসলিম সমাজও যেহাদ করার (সন্তানদের ওপর কোনো বিষয়ে চাপ দেওয়ার) অপরাধে সেই সব একই বিশেষণে ভূষিত হবেন।

ইসলামে প্রতিরক্ষামূলক এবং ন্যায়-অন্যায়ের নির্ণায়ক যুদ্ধের অনুমতি আছে, যার জন্য পবিত্র কোর'আনে 'কিতাল' আরবি কথাটি ব্যাবহার করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামি যুদ্ধে নারী , শিশু, বৃদ্ধ, পঙ্গু, ধর্মীয় পুরোহিত, ভিখারী, পাগল বা কোনো অসামরিক ব্যাক্তির উপরে আক্রমণ করা নিষিদ্ধ।- কিন্তু তার পরেও ইসলামের নামে এই সব ভিত্তিহীন অভিযোগ শুনতে হয়, বুদ্ধিজীবি লেখকদের নির্বুদ্ধিতা ও ধান্দাবাজির কারণে।

আর নির্বিচারে অমুসলিমদের হত্যা করাই যদি যিহাদ হত, তাহলে নিশ্চয়ই উক্ত লেখককে এদেশের ২০ কোটি মুসলিমদের মধ্য থেকে অনেকেই এপর্যন্ত বহুবার হত্যা করার চেষ্টা করে থাকতেন। তার মধ্যে এক-আধ জন হয়তো সফলও হয়ে যেতেন। কিন্তু তেমন কিছু হয়নি ।এই বাস্তব ঘটনাই যিহাদের ব্যাপারে তাঁর জ্ঞানকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে।

লেখক তাঁর ইসলামিক জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে বা কোনো অভিসন্ধির অংশ হিসাবে, বাংলাদেশকে ইসলামী দেশ বলেছেন। তাঁর সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার যে একটি দেশের প্রকৃতি তার সংবিধানের প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে। কোনো দেশকে তখনি ইসলামিক বলা যেতে পারে , যখন তার পরিচালনকারী সংবিধ্যানটি হবে পবিত্র কোর'আন। আমরা যতদূর জানি বাংলাদেশের সংবিধান পবিত্র কোর'আন নয়, তাদের পরিচলনকারী সংবিধান তাঁরা নিজেরা লিখেছেন ।— সুতরাং বাংলাদেশ ইসলামিক দেশ নয়।

তিনি পৃ. ২০ তে পবিত্র কোর'আনের কয়েকটি আয়াত অপ্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরেছেন মানুষকে মনের ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য। এটা নতুন নয়; মানবতার দুশমনরা এ কাজ হামেশাই করে আসছেন। তাদের হাজারবার উত্তর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারপরেও তাদের সংশোধন হয়নি । কারণ তাঁরা শিখতে চাননি , শুধু ঘৃণা ছড়াতে চান। তিনি সূরা তাওবার (অধ্যায়-৯) কেবলমাত্র ৫ নং আয়াতটি উদ্ধৃত করেছেন এইভাবে, "অংশীবাদী কাফেরদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের জন্য ঘাঁটি গেড়ে ওৎ পেতে থাকবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে।(কোরান-৯ঃ৫)।"এই কথা শোনার পরে যে কারো মনে ইসলাম ও মুসলমান সম্বন্ধে ঘৃণা জন্মাতে বাধ্য। কিন্তু যদি বলা হয় যে, ভারত-চীন যুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী সৈন্যদের বলেছিলেন যে যেখানেই পাবে চীনাদেরকে ঘেরাও করবে, ধরবে এবং হত্যা করবে। তাহলে, এতে কি কোনো ভুল বা অমানবিকতা কেউ খুঁজে পাবেন? — এটাই যুদ্ধের নিয়ম, এটাই স্বাভাবিক। সৈন্যদের মনোবল দৃঢ় করার জন্য

যে কোনো আর্মি কমান্ডার এটাই বলবেন। তিনি কখনও বলবেন না যে-শত্রু সৈন্যরা যখন ধেয়ে আসবে তোমাদের আক্রমণ করার জন্য তখন তোমরা সব পালিয়ে যেও বা লুকিয়ে যেও। লেখক পবিত্র কোর আনের পুরো আয়াতটি ইচ্ছাকৃত ভাবেই উদ্ধৃত করেননি। আয়াতটি শুরু হয়েছে এইভাবে, ''অতপর হারাম (নিষিদ্ধ) মাস যখন অতিবাহিত হয়ে যাবে ...।'' অর্থাৎ শত্রুদেরকে আক্রমণ করার ব্যাপারে আল্লাহ কয়েকটি মাসকে (৪ মাস) নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, অর্থাৎ ঐ কয়েক মাস তাদেরকে আক্রমণ করা যাবে না। কারণ হচ্ছে — মদিনার মুসলিম ও মক্কার অমুসলিমদের মধ্যে একটা শান্তি চুক্তি ছিল, যার নাম ছিল ''হোদারবিয়ার শান্তি চুক্তি'' (৬২৮ খ্রী.)। এই চুক্তি অনুসারে উভয় পক্ষের মধ্যে ১০ বছর শান্তি বজায় থাকার কথা ছিল। কিন্তু মক্কাবাসীরা চুক্তিটি সম্পাদিত হওয়ার মাত্র ২য় বছরে মুসলিম পক্ষের উপরে আক্রমণ করে বসে। নবী(স.) তাদেরকে তিনটির মধ্যে যে কোনো একটি শর্ত পালন করতে বলেন — ক) আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাও। খ) ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দাও, গ) চুক্তি ভঙ্গ করো মক্কার অমুসলিমরা তৃতীয়টি পছন্দ করলেন। অর্থাৎ, অমুসলিমরা একতরফাভাবে শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে চরম অপরাধ করলেন। এরপরেও, দয়াময় আল্লাহতাআলা অপরাধকারীদেরকে চার মাসের অবকাশ দিয়েছেন নিজেদের সংশোধন করে নেওয়ার সুযোগ হিসাবে, যা পবিত্র কোর'আনের ঐ সূরার (সূরা-তাওবা) প্রথম আয়াত থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কারণে লাফ মেরে কেবলমাত্র ৫ নং আয়াতটি উদ্ধৃত করেছেন। ফলে আয়াতটি মানে বিকৃত হয়ে এমন হয়েছে যে মনে হচ্ছে মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর সাধারণ নির্দেশ হল যাতে তারা সবসময়, সর্ব অবস্থায় অমুসলিমদের হত্যা করবে। উপরের উদাহরণে, ভারত-চীন যুদ্ধের প্রসঙ্গে না বলে, যদি বলা হয় যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, যে যেখানেই পাবে চীনাদেরকে হত্যা করবে- তাহলে এর মানে সর্বনাশা হবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ও সাধারণ মানবতার ক্ষেত্রে এ এক ভয়ঙ্কর কথা হবে। একইভাবে কোনো ধর্ম সম্বন্ধে কেউ যখন এই ধরণের প্রসঙ্গহীন বিষোদগার করেন, তখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

তবে যে কথাটি পৃথিবীর কোনো আর্মি কমান্ডার বললেন না, সেটিই আল্লাহ বলেছেন সেই ৫ নং আয়াতের শেষের দিকে যে অংশটি ঐ পুস্তকের লেখক উদ্ধৃত করেননি। যে, তারা (মক্কার অমুসলিমরা) যদি তওবা করে অর্থাৎ, আর এই ধরণের কাজ করবে না বলে যদি প্রতিজ্ঞা করে, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। আবার আর এক ধাপ এগিয়ে দয়াময় আল্লাহর পরের বাক্যে ( আয়াত ৬) মুসলিমদের আদেশ

দিচ্ছেন যে শত্রুদের মধ্যে থেকে যদি কেউ তোমাদের কাছে আশ্রয় চাই তাহলে তাকে শুধু ছেড়ে দিও না, তাকে নিরাপত্তা সহকারে বিপদমুক্ত জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছাড়ো। কিন্তু উক্ত লেখক এই মানবতার, শান্তির কথাগুলির ধারে কাছেও যান নি। যাবেন কি করে? তিনি তো কলম ধরেছেন মানুষের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ, অশান্তি ছাড়ানোর উদ্দেশ্যেই।

একই ভাবে, লেখকের উত্থাপিত কোর'আনের কয়েকটি প্রসঙ্গহীন অংশ আয়াতের সঠিক প্রসঙ্গ অতি সংক্ষেপে দেওয়া হল। তাঁর উদ্ধৃতি "যেখানেই তাদের পাবে হত্যা করবে (ঐ-২/১৯১)"। — এই আয়াতটি মক্কার কোরায়েশদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যারা নবীর (সা.) - এর আত্মীয় ছিলেন, কিন্তু তাদের অপরাধ ছিল যে তাঁরা মক্কা শহরে বসবাসকারীদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন তাদের প্রতি অমানবিক অত্যাচার করতেন। তাদেরকে ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করতেন, মরুভূমির উত্তপ্ত বালির উপরে শুইয়ে রেখে বুকের উপরে ভারি পাথর চাপিয়ে দিতেন, চাবুক মারতেন, জল পান বন্ধ করে দিতেন, ইত্যাদি। এই অকথ্য অত্যাচারে অনেক নব্য মুসলিম প্রাণ হারাতে বাধ্য হয়েছিলেন।— তাই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার খাতিরে এহেন অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ মুসলমানদের যুদ্ধ করতে বলেছেন। কোর'আনে আল্লাহ এখানে 'কিতাল' শব্দটি ব্যাবহার করেছেন, যিহাদ নয়।- এর দুটি অর্থ হয় — যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করা। কিন্তু উক্ত পুস্তকের লেখক শুধু হত্যা অর্থটিকেই নিয়েছেন—কারণ তিনিই ভালো জানেন।

বান্মচারীবাবুর উক্তি, "তাদের গ্রেপ্তার কর, যেখানে পাও হত্যা কর, তাদের মধ্যে থেকে সাহায্যকারী গ্রহণ করো না (ঐ ৪/ ৮৯)।',' অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমার নিকটবর্তী তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর এবং ওরা তোমাদের কঠোরতা দেখুক (ঐ, ৯/১২৩)"। এই আয়াত দুটি কোনো অমুসলিম (কাফের )-এর বিরুদ্ধে ব্যাবহার করা হয়নি; বরং মুসলিমদের বিরুদ্ধেই ব্যাবহার করা হয়েছে। যে সব মুসলিম উপরি উপরি নবী (সা.) ও মুসলমানদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতো কিন্তু ভিতরে মক্কার শত্রুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতো, তাদেরকেই ন্যায় বিচারক আল্লাহতাআলা গ্রেফতার ও হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। এই ধরণের লোককে ঘরের শত্রু বিভীষণ বা দেশদ্রোহী বলা হয়। যে কোনো দেশের আইন অনুসারে এই গাদ্দারদের শাস্তি তাই দেওয়া হয় যা আল্লাহতাআলা আদেশ দিয়েছেন।

তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আরও একবার পবিত্র কোর'আন থেকে উদ্দেশ্যপ্রানোদিত আংশিক উদ্ধৃতি দিয়ে মানুষকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাতে

চাইছেন। তাঁর উদ্ধৃতি , "তাদের হত্যা কর, কিংবা তাদের শুলবিদ্ধ কর, অথবা তাদের হস্তসমূহ ও পদসমূহ বিপরীত দিক হতে কর্তন কর ( ঐ -৫/৩৩)।" সম্পূর্ণ আয়াতটি হল, "যারা আল্লাহএবং তাঁর রসূলদের সাথে লড়াই করে এবং যমীনে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তি হত্যা কিম্বা শুলে চড়ানো; অথবা তাদের হাত ও পা উল্টো দিক হতে কেটে ফেলা, কিংবা দেশ হতে নির্বাসিত করো ।এই লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এই দুনিয়ার ঃ কিন্তু পরকালে তাদের জন্য এ অপেক্ষাও কঠিনতম শাস্তি রয়েছে।" সুতরাং আয়াতটি পড়লে সকলেই অতি বুঝতে পারবেন যে এটি অন্যায় - অত্যাচারীদের প্রতি অল্লাহর ন্যায় দন্ড। কিন্তু উক্ত পুস্তকের লেখক ইচ্ছাকৃত ভাবে পবিত্র আয়াতের প্রথমে অর্ধেক অংশটি বেমালুম হজম করে দিয়েছেন ।যাতে মানুষ পুরো ব্যাপারটি বুঝতে পারেন এবং ইসলামের শুধু নির্দয়তা ও কঠোরতাই প্রকাশ পায়— ফলস্বরূপ ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। — ব্রহ্মচারীবাবুকে আমার প্রশ্ন- আজকের তথাকথিত উন্নত, মানবিক ও যুক্তিবাদী সভ্যতাতেও যদি কেউ রাষ্ট্রের শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করে, দেশের আইন-শৃঙ্খলার বিপর্যয় ঘটায় ; তাহলে সেই শাসক বা রাজা সেই ব্যাক্তিকে কী কোনো শাস্তি দিবেন না? যুক্তির ও মানবিকতার উত্তর হল- সেই ধরণের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা কারী বা অপরাধীর একমাত্র শাস্তি হল মৃত্যুদন্ড এবং এই অন্তিম দন্ড পাওয়ার আগে তাকে অনেক অপমান ও নির্যাতন (পুলিসি) সহ্য করতে হয়। আমাদের দেশেই সাম্প্রতিক ঘটনার আমরা এরকম উদাহরণ প্রত্যক্ষ করেছি। যেমন — ধর্ষণকারী ধনঞ্জয় চ্যাটার্জিকে ফাঁসি দিয়েছে রাষ্ট্র , মুম্বাই আক্রমণকারী আজমল কাসাভের ফাঁসি দিয়েছে রাষ্ট্র, পার্লামেন্ট আক্রমণে জড়িত আফজল গুরু — এর ফাঁসি দিয়েছে দিয়েছে রাষ্ট্র ইত্যাদি। তাহলে ব্রহ্মচারী বাবু কি বলতে চাইছেন যে , মানুষ শাসক ও তার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করলে মৃত্যুদন্ড যুক্তি যুক্ত -কিন্তু সকল রাজার রাজা সকল শাসকের শাসক আল্লাহ ও তাঁর নবীর (সাঃ) বিরুদ্ধে লড়াই করলে মৃত্যুদন্ড যুক্তি যুক্ত নয়? — সিদ্ধান্ত বিচক্ষণ পাঠকদের উপরেই রইল।

আর একটি অসম্পূর্ণ প্রসঙ্গহীন আয়াত তুলে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অকারণ উত্তেজনা ও সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। তিনি লিখেছেন , "ওরাই অভিশপ্ত এবং ওদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করা হবে (ঐ ৩৩/৬১) ।" প্রসঙ্গ সহ পুরো ব্যাপারটা পবিত্র কোর'আন থেকে তুলে দেওয়া হল-"মুনাফেক লোকেরা এবং যাদের মনে দোষ রয়েছে, আর যারা মদিনায়

উত্তেজনাকর গুজব ছড়াচ্ছে, তারা যদি নিজেদের একাজ তেকে বিরত না থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহনের জন্য আমরা তোমাকে প্রস্তুত করব। পরে এই শহরে তোমার সাথে তাদের বসবাস কঠিনই হবে। তাদের উপর চারিদিক হতে লানত বর্ষিত হবে। যেখানেই তাদের উপর চারিদিক হতে লানত বর্ষিত হবে। যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে ও নির্মমভাবে হত্যা করা হবে।"— মুনাফেক সেই লোকদেরকে বলা হয় যারা বাইরে মুসলমানদের সঙ্গে তাদের বন্ধু সেজে থাকতো , কিন্তু আসলে তারা ছিল মুসলমানদের শত্রু এবং মুসলমানদের যারা শত্রু ছিল এই লোকের তাদের ভালো বন্ধু ছিল ।এই লোকের মদিনার মুসলিম রমনীদের চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করার উদ্দেশ্যে নানা রকমের গুজব ছড়াতো এবং তাদের দুঃসাহস এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে একবার নবী(সা.) — এর পবিত্র এক স্ত্রীর নামও তাতে জড়িয়ে দিয়েছিল। ইসলামে নারীদের চরিত্র কোন ছেলেখেলা বা বড়োদের টাইম- পাস , মনোরঞ্জনের বিষয় নয়। কেউ যদি কোনো নারীর চরিত্র নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলে এবং তার উত্থাপিত প্রশ্নের সমর্থনে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তাহলে সেই ব্যাক্তিকে ৮০ টি কড়া চাবুক মারা হয় এবং জীবনে আর তার কোন সাক্ষী গ্রহণ হয় না । ইসলামে নারী চরিত্রের ওপর এতটাই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আজকের "নারী চরিত্রের ওপর এতটাই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে , আজকের "নারী স্বাধীনতা" স্লোগানের চ্যাম্পিয়ান দেশগুলোতেও কী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়? সুতরাং আল্লাহতআলা সেই সব ছদ্মবেশী মুসলিমদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিয়েছেন যারা নারী চরিত্রের ওপরে কলঙ্ক লেপনের চেস্টা করে এবং সমাজে কলুষতা ছড়ায়।

লেখক তাঁর পুস্তকের ২১ নং পৃষ্ঠায় ইসলামের বিরুদ্ধে এক মারাত্মক অভিযোগ করেছেন এই বলে যে, "আল্লাহ কোরাণে কোথাও এ কথা বলেননি যে ওহে মুসলমানরা , তোমরা সৎ ও নৈতিক জীবণযাপন কর এবং লেখাপড়া শিখে মানুষ হও। পক্ষান্তরে, আল্লার নির্দেশ হল , ওহে মুসলমানগণ, তোমরা অমানুষ ও জানোয়ার হও, যত ইচ্ছা পাপ ও দুষ্কর্ম করতে থাক। যেহেতু তোমরা মুসলমান , তাই কেয়ামত বা শেষ বিচারের দিন আমি তোমাদের পাহাড় - প্রমার পাপ ক্ষমা করে দিব।" — এটা এক অমার্জনীয় অপরাধ। পবিত্র কোর'আনের প্রথম কথাই হল 'ইকরা ' অর্থাৎ পড় । "ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লজি খলক," অর্থাৎ পড় তোমরা সৃষ্টি কর্তার নামে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা নবীর (সা.) প্রতি এটিই প্রথম বাণী, যেটা পবিত্র কোর'আনের ৯৬নং অধ্যায় লিপিবদ্ধ আছে। তাই সেখকের অভিযোগ ডাহা মিথ্যা। অজ্ঞানতা , নাকি

দুরভিসন্ধি। এর পরে তিনি আল্লাহর নামে যে সব নোংরা গালাগালি মুসলমানদেরকে দিয়েছেন -সেগুলির প্রমান চাই। তিনি কী জানেন যে পাপ ও দুষ্কর্মের ইসলামে শাস্তি কি? খুনের শাস্তি হল খুনীকে হত্যা করা ; চুরির শাস্তি হল — চোরের হাত কাটা ; ব্যাভিচারের শাস্তি হল মৃত্যুদন্ড ; আর মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি তো আগেই বলা হয়েছে যে, আশি ঘা চাবুক মারা । যে সরকার সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা, নীতি — আদর্শ রক্ষার ব্যাপারে এতটা তৎপর, তাকে কী করে বলা যেতে পারে যে তিনি তার নাগরিকদের বলতে পারেন, "ওহে নাগরিকগণ, তোমরা অমানুষ ও জানোয়ার হও, যত ইচ্ছা পাপ ও দুষ্কর্ম করতে থাক।"এর পরেও যদি কেউ একথা সেই শাসকের উপরে চাপাতে চান, তাহলে বুঝতে হবে যে সেই অভিযোগকারী নিতান্তই অজ্ঞ, বা পাগল, বা সে নিজেকে এতোটাই বুদ্ধিমান মনে করেন যে বাকি সকলকে বোকা বানানোর মতো দুঃসাহস পোষন করেন।

লেখক তাঁর মূল্যবাণ পুস্তকটির জ্ঞান গর্ভ আলোচনা শেষে অতি সহজ বস্তাপচা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এইভাবে , "এরই পরিণতি হিসাবে দেখা যায় যে ,সারা বিশ্বে, সমস্ত ব্যাপারে মুসলমানরা হল সব থেকে অনগ্রসর ।" বন্ধু আজকের মুসলিমদের অনগ্রসরতার কারণ তাদের ধর্ম নয় , বরং কারণটি হল তাদের ধর্ম না মানা। ইসলামকে তারা সঠিক স্পিরিটে যতদিন মেনেছেন ততদিন মুসলিমরা সভ্যতার শিখরে ছিলেন। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কারা পৃথিবীকে সভ্যতা শিখিয়েছে? জ্ঞান - বিজ্ঞান- সাহিত্য- রাজনীতি শিখরে কারা ছিলেন ? ইউরোপ কাদের কাছ থেকে সভ্যতা শিখল? ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশ্ববিখ্যাত ব্যাক্তিত্ব এম. এন.রায় (মানবেন্দ্র নাথ রায়, আসল নাম নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য )-এর মতে , "যে সময় ইউরোপ ইতিহাসের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, সেই সময় দীর্ঘ পাঁচশো বছর ধরে আরবরা জ্ঞান -বিজ্ঞান চর্চার উৎকর্ষতায় অবস্থান করছিল। ঐ একই সময়ে সময়ে ইন্ডিয়ান অবস্থাও ভালো ছিল না , সেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীলতার অধীনে বৌদ্ধধর্ম অবদমান ও বিকৃতির শিকার হচ্ছিল। অবশেষে বৌদ্ধধমের্র বিপ্লবকে এমনভাবে নিঃশেষ করা হয়েছিল যে পরবর্তী কালে মুসলিমদের পক্ষে এই দেশটা দখল করা খুবই সহজ হয়েছিল"। (সূত্রঃ Roy,.M.N., (1981), Historical Role of Islim ,4th Edn.p. 58, New Delhi: Ajanta Publication) । আরও একজন বিখ্যাত ব্যাক্তির উদ্ধিতি দিচ্ছি যে, আমাদের নবী(সা.) কেমন ব্যাক্তি ছিলেন- তাঁর দর্শন সঠিক ছিল কি না তা বোঝানোর জন্য। এক ইহুদী লেখক মাইকেল এইচ. হার্ট কিছুদিন আগে The 100 : A Ranking of the Most Influential

Persons in History নামে একখানা বই লিখেছেন । তাতে তিনি পৃথিবী সৃষ্টি থেকে এখন পর্যন্ত সারা বিশ্বে সবচেয়ে প্রভাবশালী একশো জন মণীষী সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। অনেকের হয়তো ব্যাপারটা হজম হবে না যে, ইসলামের শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) কে তিনি সেই বইয়ে প্রথম স্থান দিয়েছেন। মি. হার্ট নিজেই তার পছন্দের ব্যাপারে যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে , "পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী মণীষীদের নামের তালিকার শীর্ষে মুহাম্মদ (সা.) - এর নামটি রাখায় অনেকে আশ্চর্যান্বিত হতে পারেন , আবার অনেকে প্রশ্নও করতে পারেন ; কিন্তু তিনিই একমাত্র ব্যাক্তি ছিলেন যিনি ধর্ম এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা উভয় দিক দিয়েই চরমভাবে সফল হয়েছিলেন" ।- মনে রাখা দরকার যে , এই মন্তব্য কোনো মুসলিম তার নেতার প্রতি ভক্তিভরে করছেন না। এই উচ্চ প্রশংসা একজন ইহুদীর, যাদের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্ক কোনোদিন ভালো ছিল না , আজও নেই আর ভবিষ্যতেও থাকার সম্ভাবনা দেখছি না। তাহলে এই ধরণের চরমভাবে সফল নেতার অনুসারীরা কী করে পিছিয়ে থাকতে পারেন ?

তবে হ্যাঁ। বর্তমান কালের মুসলিমদের নিশ্চয়ই পিছিয়ে পড়া মনে হবে; তারা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে এবং কিছুটা পিছিয়ে রাখা হয়েছে তবে মুসলিমদের পিছিয়ে পড়ার কারণ তাদের ধর্ম নয়; বরং ধর্ম মেনে না চলা তাদের পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ। যতদিন তারা ইসলামকে মেনে চলেছিল ততদিন তারা উন্নতির শিখরে ছিল। তারা যখন থেকে এবং যতটাই ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে -তখন থেকে এবং ততটাই পিছিয়ে পড়েছে। তাদের বর্তমান অবস্থার জন্য প্রধানত দুটি কারণ কাজ করেছে— প্রথমত ঃ মুসলিমরা নিজেরা ইসলামের আদর্শ ছেড়ে ভোগ বিলাসে মেতে উঠলেন এবং দ্বিতীয়টিঃ খ্রিষ্টানদের বর্বরতা ক্রুশেড যুদ্ধ, যার গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে Holy War । সেই যুদ্ধ এখনও তারা চালিয়ে যাচ্ছে —সম্প্রতি ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়া, চেচনিয়া, বসনিয়া ইত্যাদি একের পর এক মুসলিম দেশে পশ্চিমাদের সেই বর্বরতা চলছে। এই যুদ্ধের এখন নতুন নাম হয়েছে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের বা সমাজবাদের লড়াই, 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। মাত্র কয়েকজন ধনী সারা বিশ্বকে অর্থের জালে জড়িয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে শোষণ ও দাসত্বের শাসন বহাল রাখতে চায়। এই কাজে তাদের একমাত্র বাধা হল সেই সব কিছুই যা সাম্য বা সমাজবাদের কথা বলে। সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করতেই ভারতে সাম্যবাদ বা সমাজবাদের বৌদ্ধধর্মকে শেষ করা হয়। তার পরে আরব দেশ থেকে উত্থিত হয় আরো বেশি সমাজবাদের আর এক ধর্ম -ইসলাম। শোষণ, বৈষম্যকারী, পুঁজিবাদী

মানসিকতা তা সহ্য করতে পারে না । আবার বিশুদ্ধ রাজনৈতিক যুদ্ধেও ইসলামকে ঠেকানো সম্ভব নয়। তাই শুরু করা হল ক্রুসেড যুদ্ধ, ধর্মের সংবেদনশীলতাকে হাতিয়ার করে। খ্রীষ্টধর্ম রক্ষার জিগির তুলে সারা পৃথিবীতে যে ধ্বংসলীলা চালানো হয়েছে , মানব সভ্যতার তা নজিরবীহিন। এরই মাঝখানে মাথাচাড়া দিয়ে দিয়ে উঠল কমিউনিজমের দর্শন বা কমিউনিস্ট আন্দোলন। এটাও পুঁজিবাদের কাছে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ হিসাবে দাঁড়ালো। পুঁজিবাদ কমিউনিজমকে দমন করার জন্য বেশি মনোনিবেশ করলো এবং তা ধ্বংস করলো। গত শতাব্দীর ৯০ দশকে রাশিয়ার পতনের পর কমিউনিজম প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে বলা যায়। তারপরে পুঁজিবাদ তার বিপুল ক্ষমতা আর সাজ- সজ্জার নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে সাম্যবাদের আরেক দর্শন ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। পুঁজিবাদের অসীম ক্ষমতা, অর্থ, সাজ সরঞ্জামের সামনে টিকে থাকা প্রায় কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ইসলামের অন্তর্নির্হিত অমূল্য আধ্যাত্মিক নৈতিক আদর্শই তাকে এই জীবনী- শক্তি দিয়েছে যে হাজার বছর ধরে সে দোদন্ডপ্রতাপ পুঁজিবাদের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। সাম্যবাদী, মানবতাবাদী এবং পুঁজিবাদ বিরোধী সকলের এই যুদ্ধে মুসলিমদের সঙ্গ দেওয়া উচিৎ।

সুতরাং মুসলিম প্রধান আরব দেহ্গুলির তথাকথিত অনগ্রসরতার কারণও তাদের রাজনীতি, অর্থনীতির উপরে সেই পশ্চিমা পুঁজিবাদের আগ্রাসন। তেল সমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলিতে পুঁজিবাদের লোলুপ দৃষ্টি। তাই, সেখানে পুতুল সরকার বসিয়ে ও অশান্তিবজায় রেখে তরল সোনা লুঠ করার সুবিধাজনক কৌশল তারা প্রয়োগ করেন। আবার, নিজের পছন্দের পুতুল বসাতে হলে অশান্তি ছড়ানো দরকার, অশান্তি জিইয়ে রাখা দরকার।—তাই কখনও তৈরী করতে হয় ওসামা বিন লাদেনকে, কখনও সাদ্দাম হুসেনকে তো কখনও আবুবকর আল বাগদাদীকে (আইসিস নেতা)। আজকের আইসিস অথবা সেদিনের বিন লাদেন কোথা থেকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ , মদত পাচ্ছে ও পেয়েছে? লেখক বন্ধু, এসব বুঝতে হলে উর্বর যুক্তিবাদী মস্তিষ্ক লাগে, এসব কথা সংকীর্ণ ঘেটো মানসিকতায় ঢুকবে না।

এত সব প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও মুসলিমরা আজকের অনান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক উন্নত নীতি-নৈতিকতা ও সভ্য জীবন যাপনের নিদর্শন দিয়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য দেওয়া হল।

অনান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলিমদের গড় প্রত্যাশিত আয়ু বেশি। ইসলামিক বিধি-নিষেধ ও হালাল -হারামের সীমানার মধ্যে জীবন যাপনের কারণে প্রথম সারির

২৫ টি মুসলিম দেশে মানুষের গড় প্রত্যাশিত আয়ু পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলোর তুলনায় বেশি। [সূত্রঃ Jamil. J, (92013), Muslims Most Civilized Yet Not Enough]। মুসলিম দেশগুলিতে সাক্ষরতার হারও অনেক ভালো। কাজাকাস্থান, তাজিকিস্থান, আজেরবাইজান, এবং তুর্কমেনিস্থানে সাক্ষরতার হার প্রায় ৯৯ শতাংশ, যেটা আমেরিকা এবং বৃটেনের তুলনায় ভালো। ৯০ শতাংশের চেয়ে বেশি সাক্ষরতা আছে- উজবেকিস্থান, বোসনিয়া ও হার্জেগেভিনা, ব্রুনেই, দারুসসালাম,কুয়েত, প্যালেস্টিনিয়ান অথারিটি, কাতার,ইন্দোনেশিয়া, মালায়াশিয়া , জর্ডান এবং ইউনাইটেড আরব আমিরাতসে। আবার তুর্কি, বাহরাইন, লেবানন, লিবিয়া, ইরান এবং ওমানে সাক্ষরতার হার ৮০ শতাংশের বেশি। কানাডিয়ান রিসার্চ ফার্ম Science Matrix-এর ২০১০ সালের গবেষণা অনুসারে সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইরান সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। (বৃদ্ধি সূচক ১৪.৪ ) এবং এর পর আছে দক্ষিণ কোরিয়ার নাম (বৃদ্ধিসূচক ৯.৮)। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির নিরিখে, ২০০২ সালে ইরানের অবস্থান ছিল পৃথিবীর গড় মানের তুলনায় ১১গুণ বেশি (সূত্র ঃ ঐ )। সর্ব্বোচ্চ পরিমান গড় মাথাপিছু আয়ের পাঁচটি দেশের মধ্যে দুটি আরব মুসলিম দেশ- কাতার এবং ইউনাইটেড আরব এমিরাতস। এই তালিকার প্রথম দিকের ৫০ টি দেশের মধ্যে আটটি হল মুসলিম দেশ। বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিবেদন অনুসারে ২০২৫ সালে ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর ছয়টি বৃহৎ অর্থনীতির মধ্যে একটি হবে । (সুত্র ঃ ঐ )। অপরদিকে মুসলিম দেশগুলিতে মানুষের জীবনের প্রতি সন্তুষ্টি অন্য দেশগুলির তুলনায় ভালো। পৃথিবীর যে ১৭ টি দেশে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি, তার সবগুলিরই পশ্চিমা দেশ। মুসলিম দেশগুলিতে আত্মহত্যার ঘটনা প্রায় বিরল। গবেষণার জানা গেছে যে কাতার , ইউনাইটেড আরব এমিরাতস, কুয়েত এবং সৌদি আরাবিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। আবার মানব সভ্যতার সকল নিরিখে কাতার সবচেয়ে সভ্য দেশ বলে পরিগণিতে হয়েছে। (সূত্রঃ ঐ)।

ব্রহ্মচারীবাবু মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য মানব উন্নতির সুচক Human Development Index, (HDI) - এর তালিকায় মুসলিম দেশগুলির অবস্থান সম্বন্ধে ভুল তথ্য দিয়েছেন ( ঐ পুস্তক, পৃ ২৩) । তিনি বলেছেন “এই সূচকের (HDI) - ক্ষেত্রেও আরব দুনিয়ার স্থান প্রায় সকলের নীচে”। অন্যের দিকে আঙুল তুলতে হলে আগে নিজের দিকে ভালো করে নজর দিতে হয়। তিনি তা করেননি , তিনি বলেননি যে সেই তালিকায় আমাদের দেশ ভারতের অবস্থান আরব দেশগুলোর

চেয়ে অনেক নীচে ! হ্যাঁ সত্য এটাই ! সত্যকে বেশিক্ষণ লুকানো যায় না— তাও কিছু কমবুদ্ধির লোক তা করার চেষ্টা করেন। বিশ্বের ১৮৭ টি দেশের (HDI) তালিকায় ভারতের অবস্থান যখানে ১৩৫ নং (HDI ,0.586) , সেখানে মুসলিম প্রধান আরব দেশগুলির অবস্থান হলব্রুনেই দারুসসালাম, —ক্রমিক অবস্থান ৩০ (HDI, 0.852) , কাতার ক্রমিক অবস্থান ৩১ (HDI,0.851) ;সৌদি আরাবিয়া: ক্রমিক অবস্থান হল ৩৪ (HDI,0.836); ইউনাইটেড আরব এমিরাতস, ক্রমিক অবস্থান ৪০ (HDI ,0.827) ; বাহারাইন -ক্রমিক অবস্থান ৪৪ (HDI ,0. 815) কুয়েত ক্রমিক অবস্থান ৪৬ ( HDI ,0.814) ; মনে হয় উদাহরণ আর বেশি দরকার নেই। (সূত্র ঃ http/ en.wikipedia. org /wiki/ list_of_countrieses_Human_Development_Index , retrieved on 27th March, 2015) , লেখক এই স্বাভাবিক প্রশ্নটির উত্তর দেবেন কি ?- আপনার কাল্পনিক তথ্য অনুসারে আরব দুনিয়ার দেশগুলি (HDI)— এর মান কম ধরে নিয়ে আপনি তার দায় চাপিয়েছেন ইসলামের দর্শনের উপরে; তাহলে ভারতের (HDI) এর মান আরব দুনিয়ার চেয়ে প্রায় সাড়ে তিনগুন খারাপ কেন ? এক্ষেত্রে কোন ধর্ম দর্শনকে আপনি দায়ী করবেন? - জোচ্চুরির একটা সীমা আছে! একটি সহজ প্রশ্ন ওঠে, যে উক্ত লেখক এইরকম ডাহা মিথ্যা কথা বললেন কেন? ইসলাম ও মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য কি? — আমরা দৃঢ়কণ্ঠে তাঁর কাছে কারণ জানতে চাই!

তিনি আবারও ইসলামকে অন্ধ বিশ্বাসের দর্শন প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, '(ইসলামে) নতুন করে সত্য আবিস্কার করার জন্য বৃথা পরিশ্রম করা নয়।' — আল্লাহ তাঁর পবিত্র কেতাবের অসংখ্য জায়গায় মানুষকে তাগিদ দিয়েছেন যে তারা যেন সত্য খোজার চেষ্টা করেন, জ্ঞান অন্বেষণের জন্য সাধনা -পরিশ্রম করে । নবী (সা.) জ্ঞান ও জ্ঞানীর এতটাই সম্মান করতেন তা একটি ঘটনা থেকে প্রমান করা যায়। বদর যুদ্ধে (৬২৪ খ্রী. ) মুসলমানরা জয়লাভ করলে শত্রুপক্ষের কিছু সৈন্যকে যুদ্ধবন্দি করা হয়। নবী(সা.) আদেশ দিলেন যে বন্দীদের মধ্যে যারা শিক্ষিত আছেন তারা যদি দশ জন মুসলিমকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেন , তাহলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।— এ থেকে কি প্রমানিত হয়? এই হচ্ছে জ্ঞান ও জ্ঞানীর ব্যাপারে দেঢ় হাজার বছর আগে ইসলামের দর্শন। পৃথিবীর ইতিহাস থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোন মানবতাবাদী শাসক যুদ্ধবন্দির মুক্তির জন্য এই শর্ত রেখেছেন বলে কারও জানা নেই। নবী(সা.) এর আরো একটি হাদিস আছে যে তিনি মুসলমানদেরকে সেই সময়ে নির্দেশ দিয়েছেন,

যখন যানবাহন উপলব্ধ ছিল না , দূরে যাত্রা প্রচন্ড বিপদ সংকুল ছিল , যে জ্ঞান অন্বেষণের জন্য দরকার হলে চীন দেশেও যাও। এই উচ্চ মানসিকতার নবী(সা.) এবং তাঁর দর্শনকে আজ ব্রহ্মচারীবাবুর মতো ব্যাক্তির কাছ থেকে শুনতে হবে যে ইসলামে জ্ঞান অন্বেষণকে বাধা দেওয়া হয়েছে, ইসলাম এক অন্ধবিশ্বাসের ধর্ম!

তিনি সাচার কমিটির রিপোর্ট উল্লেখ করে বলেছেন, "স্কুল ও কলেজে মুসলমান ছাত্র - ছাত্রীর দেখা পাওয়া গেলেও, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। তেমনি সরকারী ও বেসরকারী চাকরী, কোর্ট -কাছারী, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীতেও মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, একমাত্র জেলের কয়েদীদের মধ্যে মুসলমান সংখ্যা আশ্চর্যজনক ভাবে বেশী। ... মুসলমানদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা অনেক বেশি।"— সাচ্চার কমিটির রিপোর্টেই এর উত্তর দেওয়া আছে যে মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য, বঞ্চনা (সেখানে 'Dicrimination' শব্দটা ব্যাবহার করা হয়েছে) করা হয়েছে এবং হচ্ছে।— এখন রাষ্ট্র নিজেই যদি কোনো একটা সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্য করে তাহলে সেই সম্প্রদায়ের পক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভব নয় ।কিন্তু লেখক উদ্দেশ্য প্রানোদিত ভাবেই সাচার কমিটির প্রতিবেদনে সেটা পড়েন নি। এই বঞ্চনা শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক, ব্যাঙ্কের লোন থেকে সরকারী সুযোগ -সুবিধার বন্টন, পরিষেবা, চাকরী, সর্বত্র বিরাজমান ( সুত্র ঃ সাচার কমিটির প্রতিবেদন, ২০০৬)।

বর্তমান আমরা সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি যে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে যাদেরকে ধরা হচ্ছে, তাদের অধিকাংশই মুসলিম।এর ফলে সাধারণ মানুষের মনে হতেই পারে যে মুসলিমরা প্রায়শই সন্ত্রাসবাদী হয়ে থাকেন। এটা কতটা সত্যি, তা সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচার এবং প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান মি. মার্কেণ্ডেয় কাটাজুর বক্তব্য থেকে শোনা যাক। তিনি বলেছেন, "গণমাধ্যমের এখন সাধারণ প্রবণতা হল মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে এবং এমন এক সম্প্রদায় হিসাবে উপস্থাপণ করা যারা বোমা ছুড়ে ও বোমা ফাটায়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হল যে ৯৯ শতাংশ হিন্দু, মুসলিম ,খ্রীষ্টান এবং অনান্য ধর্মের অনুসারিয়া ভদ্র এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ"- তিনি গণমাধ্যমকে আত্ম- বিশ্লেষণ করতে, সংবেদনশীল খবর প্রচার থেকে বিরত থাকতে এবং দায়িত্ববোধ ও পেশাদায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, যখনি এবং যেকানেই কোনো বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে, তৎক্ষণাৎ কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বা তদন্ত ছাড়াই, তার দায় কোন মুসলিম সংগঠনের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়। যেটা কোন ভাবেই সঠিক নয়। তাঁর মতে কোনো অসামাজিক বা দুষ্কৃতিকারী

কোনো ব্যাক্তিই মেল পাঠাতেই পারে। আর যেভাবে বোমা বিস্ফোরণের খবরগুলি টিভিতে এবং খবরের কাগজের প্রচার করা হয় তাতে দর্শক পাঠকদের মনে হয় সে সমস্ত মুসলমানই সন্ত্রাসবাদী বা খারাপ লোক ;যেটা আদৌ সত্য নয় [ সূত্রঃ The Milli Gazette,( 2011), 283 , 12 (21), p-5)]। এতো গেল মুসলিমদের "সন্ত্রাসবাদী" আখ্যা দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর যেগুলি সমস্ত মিডিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে হেডলাইন হিসাবে প্রকাশ ও প্রচার করে। কিন্তু তার পরে কী হয় ? তারপর, সেই ধৃত ব্যাক্তিকে ৮/১০/১৫ বা ২০ বছর পুলিসের থার্ড ডিগ্রি সহ্য করতে হয়, লক আপে বন্দী থাকতে হয়। শেষ পর্যন্ত একদিন 'বিচার' শেষ হয়। প্রায় ৯৫ শতাংশ এই ধরণের কেসে সেই আটক মুসলিম ব্যাক্তিটিকে জজ সাহেব মুচকি হেসে বলেন,' তুমি নির্দোষ তোমাকে বেকসুর খালাস করা হচ্ছে। ' সম্প্রতি দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ইউনির্ভাসিটির অধ্যাপক গণ, Jamia Teacher's Solidarrity Association-এরপক্ষ থেকে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন, যেটির নাম হল Framed, Damned, Acquitted: Dossiers of a Very Special Cell- এই প্রতিবেদনে সন্ত্রাসবাদী বলে মুসলিমদের আটক, অত্যাচার এবং পুরো বিচার প্রক্রিয়া সহ শেষ বিচারের রায় সম্বলিত ১৬ টি মামলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া আছে। প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রেই আটক ব্যাক্তিদেরকে কোর্ট নির্দোষ বলে মুক্তি দিয়েছেন এবং কয়েকটি কেসে অপরাধী পুলিস অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তিও ঘোষণা করেছে বা তদন্ত কমিশন বসিয়েছেন। — এখন প্রশ্ন হল, সেই ব্যাক্তি এখন যাবে কোথায় ? তাঁর পড়াশুনো, পরিবার, বাবা মা, ভাই-বোন, ব্যাবসা -বাণিজ্য, সামাজিক সকল সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। রাষ্ট্রও তাঁর দায়িত্ব নেয় না। মুসলিম সন্ত্রাসবাদী আটকের খবরটি সংবাদ মাধ্যমগুলি ফলাও করে প্রচার করে, কিন্তু কোর্ট যখন তাদেরকে নির্দোষ বলে ছেড়ে দেয়, সে খবর কোথাও প্রকাশ পায় না ।এর ফলে, " মুসলিমরা সন্ত্রাসবাদী"এই কথাটি জনমানসে থেকে গেল। আরএহেন সন্ত্রাসবাদী' দেরকে চাকরী দিতে চাইবেন ? এর উপরে রয়েছে ব্রহ্মচারী বাবুদের মতো কিছু লোক যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াচ্ছেন। তাই মুসলিমরা চাকরি পান না, ব্যাঙ্ক লোন পান না, সামাজিক প্রতিষ্ঠা পান না।

পরিশেষে এম. এন. রায়ের একটি মূল্যবাণ মন্তব্য দিয়ে আলোচনাটি শেষ করার চেষ্টা করবো। আমাদের দেশের হিন্দুদের মধ্যে ইসলামের জ্ঞান সম্বন্ধে মূল্যায়ণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন "পৃথিবীতে কোনো সভ্য জাতি ইসলামের ইতিহাস ও মুহাম্মদের (স.) ধর্ম সম্বন্ধে এতটা অজ্ঞ নয় যতটা হিন্দুরা আছেন। আমাদের জাতীয়

দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হল আধ্যাত্মিক আগ্রাসন এবং নিন্দণীয় প্রবণতাটি মুহাম্মদের (স.) ধর্মের প্রতি বেশি করে দেখানো হয়।... ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক তাৎপর্য এবং তার বিখ্যাত সাংস্কৃতিক অবদান সম্বন্ধে একজন সাধারণ শিক্ষিত হিন্দু অতি অল্পই জ্ঞান রাখেন, এবং তার প্রতি কোনো সম্মানবোধ পোষণ করেন না। [সূত্রঃ Roy, M.N.(1981), The Historical Role of Islam, 4th Edn, p 3, Delhi : Ajanta Publication] - এই ধরণের তথাকথিত "শিক্ষিত হিন্দুর" উদাহরণ হল উক্ত পুস্তকের লেখক । তবে এই পুস্তক যদি তার জ্ঞানের অভাবের ফসল হয় , তাহলে তাঁকে মুসলিম সমাজের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। আর যদি তা না হয় ; তিনি যদি সব জেনে বুঝে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ভিলেন সাজানোর উদ্দেশ্যে অথবা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এ কাজ করে থাকেন -তাহলে তিনি ক্ষমার যোগ্য নন; তাকে দেশের আইন অনুসারে উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে। আমার মনে হয়, উক্ত পুস্তকটি লেখার পিছনে তার দ্বিতীয় কারণটিই কাজ করেছে। তাই সরকার, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, সুশীল সমাজ সকলের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এই নোংরামির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া; দুষ্কৃতিকারীকে দেশের আইন অনুসারে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া।

এই ধরণের ব্যাক্তিদের উদ্দেশ্যে আমার পরামর্শ হল— আপনারা নিজেদের দিকে খেয়াল করুন। হিন্দুধর্ম তো সন্ত্রাসী, নৃশংসতাকারী ও নিষ্ঠুরতাকারীদের দ্বারা হাইজাক হয়ে যাচ্ছে। কখনও ধর্মের নামে সন্ত্রাসীরা দিনের আলোকে সমবেত হয়ে অন্যের উপাসনালয় ধ্বংস করছে। (বাবরি মসজিদ ধ্বংস থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক চার্চগুলোতে গুন্ডাবাহিনী দ্বারা আক্রমণ ও নৃশংসতার ঘটনা ঘটানো); ও কখনও ধর্মের স্বঘোষিত রক্ষাকর্তারা অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেদের গালাগালি দিচ্ছে ( কেউ হারামজাদা, তো কেউ অন্য কিছু ), আবার কখনও বা তারা বোমা বিস্ফোরণ করে নিরীহ মানুষের জীবন-সম্পত্তির হানি করেছে (মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ, আজমের শরিফের দরগায় বিস্ফোরণ, সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ ইত্যাদি ইত্যাদি)। আপনারাই ধর্মের রক্ষাকর্তাদের ধার্মিক দায়িত্ব পালন -এর জন্য নিরপরাধ গ্রাহাম স্টাইনকে তাঁর দুই অতি নিরপরাধ শিশুপুত্রসহ আগুনে ঝলসে মরতে হয়! আপনারাই ধর্মের দোহাই দিয়ে কিছু লোক প্রকাশ্যে অন্য ধর্মের নিরীহ মানুষকে পিটিয়ে খুন করছে;দিন রাত আমাদেরকে সমাজের ঘৃণ্য - বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। ফলস্বরুপ মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস হানাহানি, আগুন,খুন, ধর্ষণ ছড়িয়ে পড়ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপে। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন জাগে।— এই কী তাহলে হিন্দু ধর্ম ? সেই ধর্মের শিক্ষা কী

এই ?- না তা নয়। ধর্ম মানুষের ভালোর জন্য এসেছে, তা এতো খারাপ হতে পারে কী করে? ঈশ্বরই পাঠিয়েছেন ধর্মের বাণী পৃথিবীতে; আর তিনি মানুষের অভিবাবক, ন্যায়পরায়ণ, মঙ্গলময়- সকলের পিতা। তাই তাঁর শিক্ষা কখনই খারাপ হতে পারে না - সন্তানদের ক্ষতির কারণ হতে পারে না। খারাপ আছে কয়েকটা লোকের মাথা। তারা তাদের বিকৃত মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনা দিয়ে সমাজকে কলুষিত করতে চায়। এবং সেই ঘোলাজলে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায়। হিন্দু ধর্মের বৃহৎ জনগোষ্ঠির কাছে আমার অনুরোধ— অন্যের ধর্মের দোষ -ত্রুটি খোঁজার বৃথা পরিশ্রম না করে আপনার নিজেদের ধর্মের অপব্যাবহার করে যারা সন্ত্রাস, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করছে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন। আপনাদের মহান ধর্মকে কয়েকজন ধান্দাবাজদের দ্বারা হাইজাক হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আমার এই বার্তা সকল ধর্মের সাধারণ মানুষদের কাছে যে নিজেদের ধর্মকে ধান্দাবাজদের দ্বোরা অপব্যাবহার হওয়া থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করুন।

এইভাবে সুস্থ ভারতীয় সমাজ গঠনে নিজ নিজ ধার্মিক, মানবিক কর্তব্য পালন করুন।

# লেখক পরিচিতি

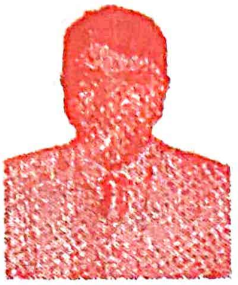

(ড.) প্রফেসর আফসর আলি, এইচ.ডি. (রসায়ন), পি.এইচ.ডি (এডুকেশন), ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার হরিশচন্দ্রপুর থানার জয়রামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৌলা বক্স ও মাতা জলেকা বিবি । তার বিধিবদ্ধ শিক্ষা জীবনের বেশিরভাগটাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে সম্পন্ন হয়, পরবর্তিতে কোলকাতা ও ক ল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। সি.এস. আই. আর. মেধাবৃত্তি প্রাপ্ত ড. আলী অপরিসীম আর্থিক ও অনান্য প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বর্তমান অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। দয়াময় আল্লাহ যার মাধ্যমে তার কাছে মুলত সাহায্য পৌঁছে দেন তিনি হলেন তার দাদা মতিউর রহমান। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় চাকরি পর্ষদ (এস. এস. সি.) — এর দ্বিতীয় বছরের পরীক্ষায় সাফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে ড. আলি তার নিজের মালদহ জেলার অন্তর্গত ভালুকা আর. এম. এম. এম. বিদ্যাপীঠ (উ. মা.) -এ ২০০১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী রসায়নের সহকারী শিক্ষকের পদে যোগদানের মাধ্যমে তার পেশাগত জীবন শুরু করেন। দেড় বছর পরে, ২০০২ সালের ১লা আগষ্ট তিনি পশ্চিমবঙ্গ কলেজ চাকরি পর্ষদ (সি. এস.সি.) — এর মাধ্যমে কোলকাতার আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস কলেজে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘ ১৬ বছর দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করেন। তারপরে আবার সি. এস. সি- এর মাধ্যমে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার তুঁতুলিয়ার খাদ্য আন্দোলনের গর্বিত ইতিহাস জরিত কলেজ, শহীদ নুরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়ে ২০১৮ সালের ৯ই আগষ্ট অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি যেমন বিজ্ঞানের গবেষণায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তেমনি তিনি সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায়ও গভীর ভাবে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। এ পর্যন্ত তিনি ইউ. জি. সি.—এর ও আই. সি. এস. এস. আর.-এর একাধিক গবেষণা প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করেছেন। যেহেতু ড. আলির জীবন-যুদ্ধ সমাজের একেবারে নীচুতলা থেকে শুরু করে প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করে এসেছেন, তাই এদেশের সংখ্যাগুরু বঞ্চিত সমাজের জীবন-সংগ্রামের সমস্যাগুলোই তার গবেষণা ও চিন্তাভাবনার প্রধান বিষয় হিসাবে ধরা পরেছে।

তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলি হল—

১) India- Ambedkar and Islam - as single Author

২) সুদী অর্থনীতিঃ প্রগতির অন্তরায় — একক লেখক হিসাবে।

৩) শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ণ — একক লেখক হিসাবে ।

৪) PEACE EDUCATION : Prasent and Future- As joint. Author

৫) শিক্ষা ব্যাবস্থাপনা ও সংগঠন— একক লেখক হিসাবে।

৬) Higher Education in India : An Outlook- As joint. Author

৭) Problem of Muslim Community Education in India & Its Remedies - As joint Author.

৮) Women and Enviromental Sustainability _As joint Author

৯) সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন— যুগ্ম লেখক হিসাবে।

১০) মাদ্রাসা শিক্ষাঃ আমাদের অবস্থান — যুগ্ম লেখক হিসাবে।

১১) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি — একক লেখক হিসাবে।

১২) সংরক্ষণ ও রাজনীতি— একক লেখক হিসাবে ।

১৩) Polio and Muslim -As Joint Author

১৪) শিখনের মান নির্ণয়— একক লেখক হিসাবে।

১৫) সমসাময়ীক ভারতবর্ষ ও শিক্ষা— একক লেখক হিসাবে।